সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • মার্চ-এপ্রিল ২০১৬

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

বিক্রমপুর সম্মিলনে
বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর
অভিভাষণ

০২
বিক্রমপুর সম্মিলনে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর অভিভাষণ

০৭
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বাংলাদেশে আমার চাকুরি খোঁজা

১১
সিদীপ মডার্ন স্কুলকে যেভাবে দেখি

১২
সিদীপের নববর্ষ উদযাপন

১৪
গল্প: ভালোবাসা একবারই হয়

১৬
ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে একটি ব্রাঞ্চ ভাল রাখার কৌশল

২০
মুরগির হাসি দেখেছেন আবুল হাসেম

২২
বই আলোচনা

২৪
শিল্পকর্ম প্রদর্শনী
ছন্দিত বর্ণের নিভৃত কথন

শিক্ষালোক

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

সম্পাদকীয়

মার্চ-এপ্রিল ২০১৬ ● ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

বাংলা নববর্ষে বাঙালি তার প্রাণের সুর খুঁজে পায়। খাবারে, পোশাকে ও গানে-নাট্যে আমরা আমাদের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সিক্ত হয়ে উঠি। এবার প্রধান কার্যালয়ে সিদীপ পরিবারের সবাই নববর্ষকে বরণের আনন্দে খানিকটা শরিক হয়েছি।

বাঙালি বিজ্ঞানী বলতে যার নাম সবার আগে আমাদের প্রত্যেকের মনে আসে তিনি জগদীশচন্দ্র বসু। বাঙালি মনে তাঁর এই বিশেষ আসনের কারণ তিনি শুধু একজন বিজ্ঞানীই ছিলেন না, ছিলেন এক মহান দেশপ্রেমিক মানবতাবাদী ব্যক্তি। বিক্রমপুরে (বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ) তাঁর পিতৃভূমিতে তিনি যে অভিভাষণটি দিয়েছিলেন, তা বারবার পড়বার মতো। আমরা এবার শিক্ষালোকে তা ছাপিয়ে দিচ্ছি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। তবে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য রিপাবলিক্যান দলের মনোয়নপ্রার্থী শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদী ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রসঙ্গ তুলে মার্কিন-প্রবাসী বিজ্ঞানী ও লেখক আশরাফ আহমেদ তাঁর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ভ্রমণের যে বয়ান করেছেন, তাতে কৌতুকের দিকগুলো সবার ভাল লাগবে।

আরো বিষয়তো আছেই। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।

সম্পাদক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

প্রচ্ছদের ছবি
হারানো সুর
শিল্পী লিটন ভূঁইয়া

ডিজাইন ও মুদ্রণ : ইনফ্রা-রেড, ফোন: ৯১২১৪৭২

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩।

Email : cdipbd@yahoo.com, web: www.cdipbd.org

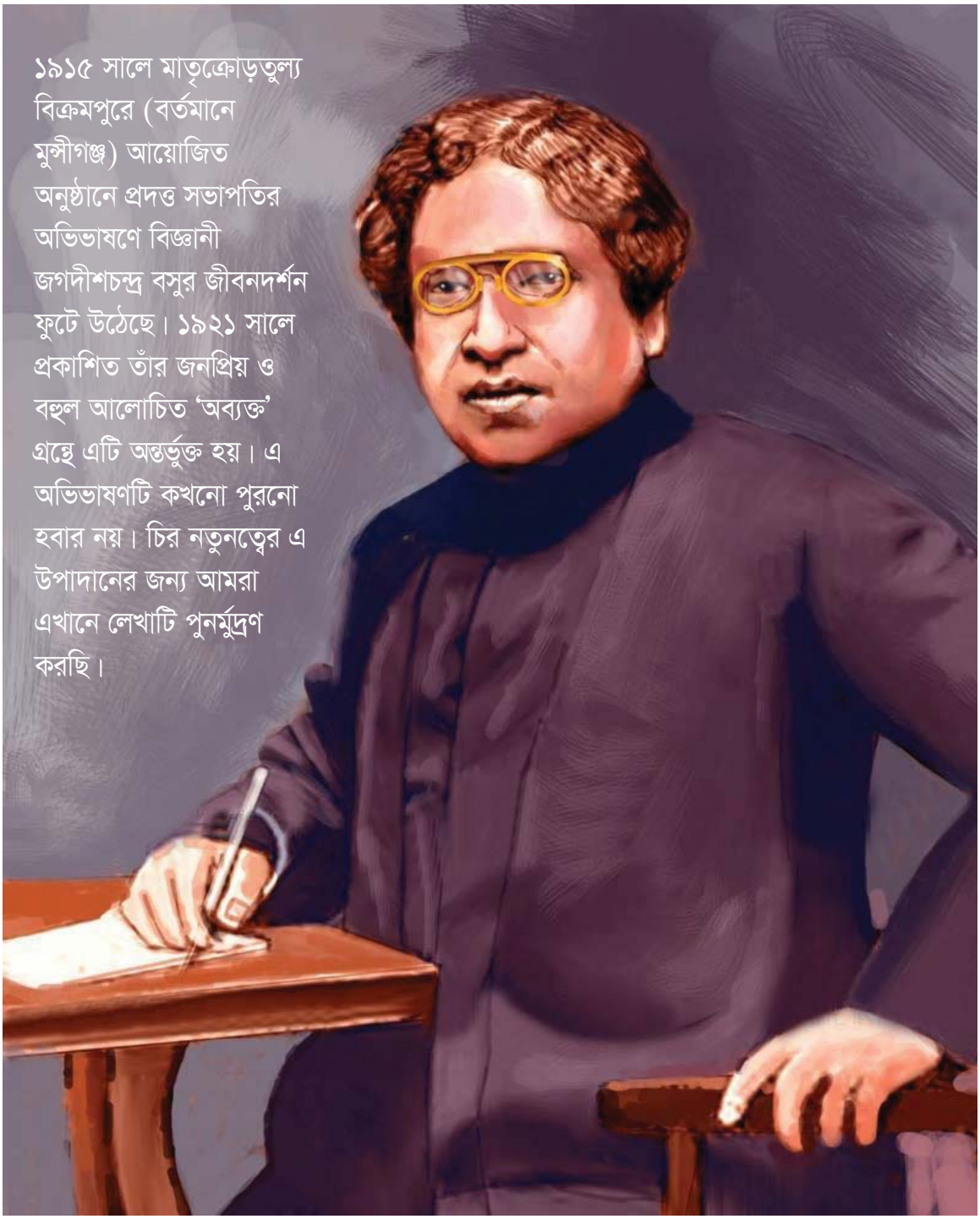

১৯১৫ সালে মাতৃক্রোড়তুল্য বিক্রমপুরে (বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ) আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে। ১৯২১ সালে প্রকাশিত তাঁর জনপ্রিয় ও বহুল আলোচিত 'অব্যক্ত' গ্রন্থে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। এ অভিভাষণটি কখনো পুরনো হবার নয়। চির নতুনত্বের এ উপাদানের জন্য আমরা এখানে লেখাটি পুনর্মুদ্রণ করছি।

বিক্রমপুর সম্মিলনে

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর অভিভাষণ

বোধন

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বংশের জননী প্রপিতামহী দেবী তরুণ যৌবনে বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র শিশুসন্তান লইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার লইয়া প্রপিতামহী দেবী যখন নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন তখন একদিন তাঁহার শিশুপুত্র শিক্ষকের তাড়নায় অন্তঃপুরে আসিয়া মাতার অঞ্চল ধারণ করিয়াছিল। যিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি একমাত্র পুত্রের উন্নতিকল্পে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছিলেন, সেই স্নেহময়ী মাতা মুহূর্ত্তে তেজস্বিনীরূপ ধারণ করিয়া পুত্রের হস্তপদ বাঁধিয়া তাহাকে শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভাবিয়া দেখিলে আমাদের মাতৃভূমি আমার তেজস্বিনী বংশজননীর মত। সন্তানদিগকে বিক্রম ও পৌরুষে উদ্দীপ্ত হইতে তাড়া দিয়া তিনি তাহাদের প্রতি আপনার গভীর বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে অঙ্কে রাখিয়া আলস্যে কাল হরণ করিতে দেন নাই; কিন্তু জগতের অগ্নিময় কর্ম্মশালে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন, "পৃথিবীর সংগ্রামময় কর্ম্মক্ষেত্রে যখন যশঃ, বিক্রম ও পৌরুষ সংগ্রহ করিতে পারিবে তখনই আমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবে।" মাতার আদেশ পালন করিবার জন্য বহুশতাব্দী পূর্ব্বে দীপঙ্কর হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত বহু বাঙ্গালী ভারতের বহুস্থানে গমন করিয়া কর্ম্ম, যশঃ ও ধর্ম্ম আহরণ করিয়াছেন। এই বিক্রমপুর বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি, মনুষ্যত্বহীন দুর্ব্বলের নহে। আমার পূজা হয়ত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এই সাহসে ভর করিয়া আমি বহুদিন বিদেশে যাপন করিয়া জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। হে জননী, তোমারই আশীর্ব্বাদে আমি বঙ্গভূমি এবং ভারতের সেবকরূপে গৃহীত হইয়াছি।

কি ঘটনাসূত্রে আমি এখানে সভাপতিরূপে আহূত হইয়াছি তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। কোন্ নিয়মে আমাদের দেশে কোন এক সঙ্কীর্ণ পথে খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে বিসদৃশ কার্য্যে নিয়োগ করা হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। যে যুক্তি অনুসারে ব্যবহারজীবীকে কলকারখানার ডিরেক্টর করা হয় সেই নিয়মেই লোকালয় হইতে দূরে লুক্কায়িত শিক্ষার্থী আজ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ আপনারা গ্রহণ করেন নাই। আপনাদের প্রীতিকর কিছু যে আমি বলিতে পারিব সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। যে বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই সে বিষয়ে কিছু বলিতে উদ্যম করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি স্বীয় জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি কেবল সেই বিষয়েই কিছু বলিব। পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, আমাদের সমুদয় শিক্ষা-দীক্ষা কেবল মনুষ্যত্বলাভের উদ্দেশ্যে মাত্র। কি করিয়া আমরা দুর্ব্বলের ক্রন্দন ও স্ত্রীজনসুলভ মান অভিমান ও আব্দার ত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত শক্তিবলে স্বহস্তে স্বীয় অদৃষ্ট গঠন করিতে পারি, তাহাই যেন আমাদের একমাত্র সাধনা হয়।

জীবনসংগ্রাম

জীবনসংগ্রামে যে কেবল শক্তিমানই জীবিত থাকে, দুর্ব্বল নির্ম্মূল হয়, একথা কেবল নিম্ন জীবের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য মনে করিতাম। কিন্তু পৃথিবী ভ্রমণের ফলে এ ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, বিশ্বব্যাপী আহবে দুর্ব্বল উচ্ছিন্ন হইবে এবং সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে করিবেন না যে, আমরা এখনও দূরে আছি বলিয়া এই খাণ্ডবদাহ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। বহুদিন হইতেই এই ভীষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে।

অহিফেন সেবনে অতি সহজেই নানা কষ্ট হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারা যায়। সুতরাং অতীত গৌরব স্মরণই আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান দুরবস্থা ভুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আর এই যে সম্মুখে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নির্ম্মূল হইতেছে, দেশী শিল্প জাপানের প্রতিযোগিতায় উচ্ছিন্ন হইতেছে, এসব কথা ভাবিতে নাই। আমাদের জড়তা সম্বন্ধে যদি আমি কোন তীব্র ভাষা ব্যবহার করি তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। আমার জীবনে যদি কোন সফলতা দেখিয়া থাকেন তবে জানিবেন, তাহা সর্ব্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিবার ফলে। স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে; যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখ।

বিবিধ সংক্রামক রোগ যেন দেশকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে চলিল। এই সব বিপদ একেবারে অনিবার্য্য নয়, কিন্তু এ আমাদের অজ্ঞতা ও চেষ্টাহীনতারই বিষময় ফল। যে পুকুর হইতে পানীয় জল গৃহীত হয় তাহার অপব্যবহার সভ্যতার পরিচায়ক নহে। কি করিয়া এই সব অজ্ঞতা দূর হইতে পারে? স্কুল বৃদ্ধি অতি মন্থর গতিতে হইতেছে; আর কোন কি উপায় নাই যাহা দ্বারা অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় সহজে প্রচারিত হইতে পারে? আমাদের সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের চিরন্তন প্রথা কথকতা দ্বারা। তাহা ছাড়া চক্ষে দেখিলে একটা বিষয়ে সহজেই ধারণা হয়। আমার বিবেচনায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় গৃহ ও পল্লী পরিষ্কার, বিশুদ্ধ জল ও বায়ুর ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ। এসব বিষয়ে শিক্ষাবিস্তার এবং

আদর্শ-গঠিত পল্লী প্রদর্শন অতি সহজেই হইতে পারে। ইহার উপায় মেলা স্থাপন। পর্য্যটনশীল মেলা দেশের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই অন্য প্রান্তে পৌঁছিতে পারে। এই মেলায় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রচলন, যাত্রা, কথকতা, গ্রামের শিল্প-বস্তুর সংগ্রহ, কৃষি-প্রদর্শনী ইত্যাদি গ্রামহিতকর বহুবিধ কার্য্য সহজেই সাধিত হইতে পারে। আমাদের কলেজের ছাত্রগণও এই উপলক্ষ্যে তাদের দেশপরিচর্য্যাবৃত্তি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন।

লোক সেবা

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশের ছাত্রগণ বহুবিধ রূপে লোকসেবায় আশ্চর্য্য পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। 'পতিতের সেবা' অথবা 'ডিপ্রেষ্ট মিশনে'ও অনেকের ঐকান্তিক উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ। এই সম্বন্ধেও কিছু ভাবিবার আছে। শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাঙ্গলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বামে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্য্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ছুটির পর যখন বয়স্যদের সহিত আমি বাড়ী ফিরিতাম তখন মাতা আমাদের আহার্য্য বণ্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কার্য্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন না। ছেলেবেলায় সখ্যতা হেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ায় "পতিত অস্পৃশ্য" জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল। যাঁহারা যৎসামান্য আহার্য্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুমূর্ষু স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্য্য পাইয়া তাহা দশজনের মধ্যে বণ্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত, উহারা না আমরা?

আর এক কথা। তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্দ্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার এই "পতিত" শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই; কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে।

শিল্পোদ্ধার

সম্প্রতি এই বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, সরকারী এক জন ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেই আমাদের দেশের শিল্পোদ্ধার হইবে। ডিরেক্টর মহোদয় সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান নহেন। এই সমস্ত গুণের সমন্বয়েও বিধাতাপুরুষ আমাদের দুর্গতি দূর করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, আমাদেরও কিছু কর্ত্তব্য আছে যাহাতে আমরা একান্ত বিমুখ। জাপানে অবস্থানের কালে দেখিলাম যে, ভারতবাসী ছাত্রগণ তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে ভারতবাসীর কোন স্থান নাই। জাপানী কিন্তু ঐ অবস্থানেই সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সে নিজের নিষ্ফলতার কারণ অন্যের উপর ন্যস্ত করে না। আমাদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি? কারণ এই যে, চরিত্রে আমাদের বল নাই, 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' একথা আমরা কেবল মুখেই বলিয়া থাকি। আমি জানি যে, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশী শিল্পের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন। বহুদিনের চেষ্টার পর তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ ব্যবহার্য্য বস্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের ব্যবসায় যে স্থায়ী হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, এ-পর্যন্ত তাঁহারা একজনও কর্ম্মকুশল ও কর্ত্তব্যশীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।

কেরাণীবাবু শত শত পাওয়া যাইতেছে; তাহাদের কেবল কলমের ও মুখের জোর। বিদেশে দেখিয়াছি, ক্রোড়পতির পুত্রও ব্যবসায় শিক্ষার সময় আফিসে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেখানকার সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে করিয়া সম্যক শিক্ষালাভ করে। আমাদের দেশে অল্পতেই লোকের মান ক্ষয় হয়। আমাদের দেশের ছাত্র, যাহারা আমেরিকা যাইয়া সেখানকার রীতি অনুসারে কোন কার্য্য

হীন জ্ঞান করে নাই; এমন কি, দারোয়ানী করিয়া এবং বাসন ধুইয়া বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করিয়াছে, এখানে আসিয়াই তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ভুলিয়া বিদেশীর বাহ্য ধরন-ধারণ অবলম্বন করে। তখন তাঁহাদের পক্ষে অনেক কার্য্য অপমানকর মনে হয়।

এসব সম্বন্ধে সম্প্রতি জাপান হইতে প্রত্যাগত জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে, সেখানে আমাদের সম্বন্ধে দুই-একটি আমোদজনক কথা চলিতেছে। তাহাদিগের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে নাকি আমাদের গৃহিণীদের পট্টবস্ত্র হইতে হাতের চুড়ি পর্য্যন্ত সংগ্রহ হয় না। এখন বাঙ্গালী বাবুদের জন্য তাহাদিগকে হুকার কল্কে পর্য্যন্তও প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত তোমরা ইউরোপের উপেক্ষা বহন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছ, এখন হইতে এশিয়ারও হাস্যাস্পদ হইতে চলিলে! আমাদের দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করিলে কোন দিন কি শিল্পে সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে?

মানসিক শক্তির বিকাশ

শিল্পের উন্নতির আর এক প্রতিবন্ধক এই যে, বিদেশে শিক্ষা করিয়া উহার ঠিক সেইমত কারখানা এদেশের ভিন্ন অবস্থায় পরিচালন করিতে গেলে তাহা সফল হয় না। অনেক কষ্টে এবং বহু বৎসর পরে যদি বা তাহা কোন প্রকারে কার্য্যকরী হয় তাহা হইলেও অতদিনে পূর্ব্বপ্রচলিত উপায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পরের অনুকরণ করিতে গেলে চিরকালই এইরূপ ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইবে। কোন দিন কি আমাদের দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে না, যাঁহারা কেবল শ্রুতিধর না হইয়া স্বীয় চিন্তাবলে উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করিতে পারিবেন?

যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানশক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও তখন আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কতকাল এই অপমান সহ্য করিবে?

ছেলেবেলায় সখ্যতা হেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ায় "পতিত অস্পৃশ্য" জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল। যাঁহারা যৎসামান্য আহার্য্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুমূর্ষু স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্য্য পাইয়া তাহা দশজনের মধ্যে বণ্টন করিল।

তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখ, এক সময়ে দেশদেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিত। তক্ষশিলা, কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিক্রমপুর যে শিক্ষার এক পীঠস্থান ছিল তাহা কি স্মরণ নাই? ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দেবতার করুণা বলিয়া মানিতে হইবে; এই সৌভাগ্য যেন চিরস্থায়ী হয়, ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথায় সেই শিষ্যবৃন্দ? এই সব আশা কি কেবল স্বপ্নমাত্রই থাকিবে? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, চেষ্টার বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহা আমি জীবনে বারম্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অজ্ঞ হিন্দুরমণী কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞানমন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব?

মুষ্টিমেয় ভিক্ষার ফলে ভারতের বহুস্থানে বিশাল বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হইয়াছে। অজ্ঞানই যে ভেদসৃষ্টির মূল এবং তোমাতে ও আমাতে যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা কেবল ভারতই সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই বিশাল একত্বের ভাব কি জ্ঞান ও সেবার দ্বারা জগৎকে পুনঃপ্লাবিত করিবে না?

ভয় করিতেছে কি, সমস্ত জীবন দিয়াও এই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে না? তোমার কি কিছুমাত্র সাহস নাই? দ্যূতক্রীড়কও সাহসে ভর করিয়া জীবনের সমস্ত ধন পণ করিয়া পাশা নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন কি এক মহাক্রীড়ার জন্য ক্ষেপণ করিতে পার না? হয় জয় কিম্বা পরাজয়!

বিফলতা

যদিই বা পরাজিত হইলে, যদিই বা তোমার চেষ্টা বিফল হইল, তাহা হইলেই বা কি? তবে এক বিফল জীবনের কথা শোন– ইহা অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি অতদিন পূর্ব্বেও দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোন উপায় নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রথম পথপ্রদর্শক হন তাঁহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নূতন উদ্যমে তিনি বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের সুবিধার জন্য তাঁহারই প্রযত্নে সর্ব্বপ্রথমে ফরিদপুরে লোন্ আফিস স্থাপিত হয়। এখানে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব পরকে দিয়াছিলেন। এখন তাহাতে শতগুণ লাভ হইতেছে। তাঁহারই প্রযত্নে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ফরিদপুরে মেলা স্থাপিত হয়। তিনিই আসামে স্বদেশী চা বাগান স্থাপন করেন। তাহাতেও তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অংশীদারগণ এখন বহুগুণ লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রথমে নিজ ব্যয়ে টেক্‌নিকেল স্কুল স্থাপন করেন এবং তাহার পরিচালনে সর্ব্বস্বান্ত হন। জীবনের শেষ ভাগে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ? হয়ত একথা তাঁহার নিজ জীবনে প্রযোজ্য হইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহুজীবন সফল হইয়াছে। আমি আমার পিতৃদেব ভগবানচন্দ্র বসুর কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে, সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন ফল ও নিষ্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

হে বঙ্গবাসী, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের কথা এখন ভাবিয়া দেখ। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, অকূল জলধি এবং হিমাচল তোমাদিগকে সমগ্র পৃথিবী হইতে নিঃসম্পর্ক রাখিতে পারিবে না। তুমি কি বুঝিতে পার না যে, অতিমানুষী শক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন পরাক্রান্ত জাতির প্রতিযোগিতার দরুন সংঘর্ষের মধ্যে তুমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছ? তুমি কি তোমার ক্ষীণশক্তি ও জীবন লইয়া জাতীয় জীবন চিরজীবনের মত প্রবাহিত রাখিবে আশা করিতেছ? তুমি কি জান না যে, ধরিত্রীমাতা যেমন পাপভার বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি-জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবনের ভার বহন করিতে বিমুখ? প্রকৃতি-মাতার এই আপাতক্রূর নির্ম্মম প্রকৃতিতেই তাঁহার স্নেহের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে। রুগ্ন ও দুর্ব্বল কতকাল জীবনের যন্ত্রণা বহন করিবে! বিনাশেই তাহার শান্তি, ধ্বংসই তাহার পরিণাম। আসিরিয়া, বেবিলন, মিশর ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! তোমার কি আছে, যাহার বলে তুমি জগতে চিরজীবী হইতে আকাঙ্ক্ষা কর? বোধ হয় পূর্ব্বপিতৃগণের অর্জিত পূণ্য এখনও কিয়ৎপরিমাণে সঞ্চিত আছে; সেই পূণ্যবলেই বিধাতা তোমার অবসন্ন মস্তক হইতে তাঁহার অমোঘ বজ্র সংহত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই দেশে এখনও ভগবান তথাগতের মন্দির ও বিহারের ভগ্ন চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভগবান বুদ্ধদেবের সম্মুখে বহু তপস্যালব্ধ নির্ব্বাণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল তখন সুদূর জগৎ হইতে উত্থিত জীবের কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সিদ্ধ পুরুষ তখন তাঁহার দুষ্কর তপস্যালব্ধ মুক্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন। যতদিন পৃথিবীর শেষ ধূলিকণা দুঃখচক্রে পিষ্ট হইতে থাকিবে ততদিন বহুযুগ ধরিয়া তিনি তাহার দুঃখভার স্বয়ং বহন করিবেন। কথিত আছে, পঞ্চশত জন্মপরম্পরায় সুগত জীবের দুঃসহ দুঃখভার বহন করিয়াছিলেন। এইরূপে যুগে যুগে দেবোপম মহাপুরুষগণ মানবের ক্লেশভার লাঘব করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই যুগ কি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? নরের দুঃখপাশ ছেদন করিবার জন্য ঈশ্বরের লীলাভূমি এই দেশে কি মহাপুরুষগণের পুনরায় আবির্ভাব হইবে না? পূর্ব্বপিতৃগণের সঞ্চিত পুণ্যবল ও দেবতার আশীর্বাদ হইতে আমরা কি চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি? যখন নিশির অন্ধকার সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতম তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙ্গিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায় এবং পরশ্রীকাতরতায়! ভাঙ্গিয়া দাও এসব অন্ধকারের আবরণ! তোমাদের অন্তর্নিহিত আলোকরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত উজ্জ্বল করুক।

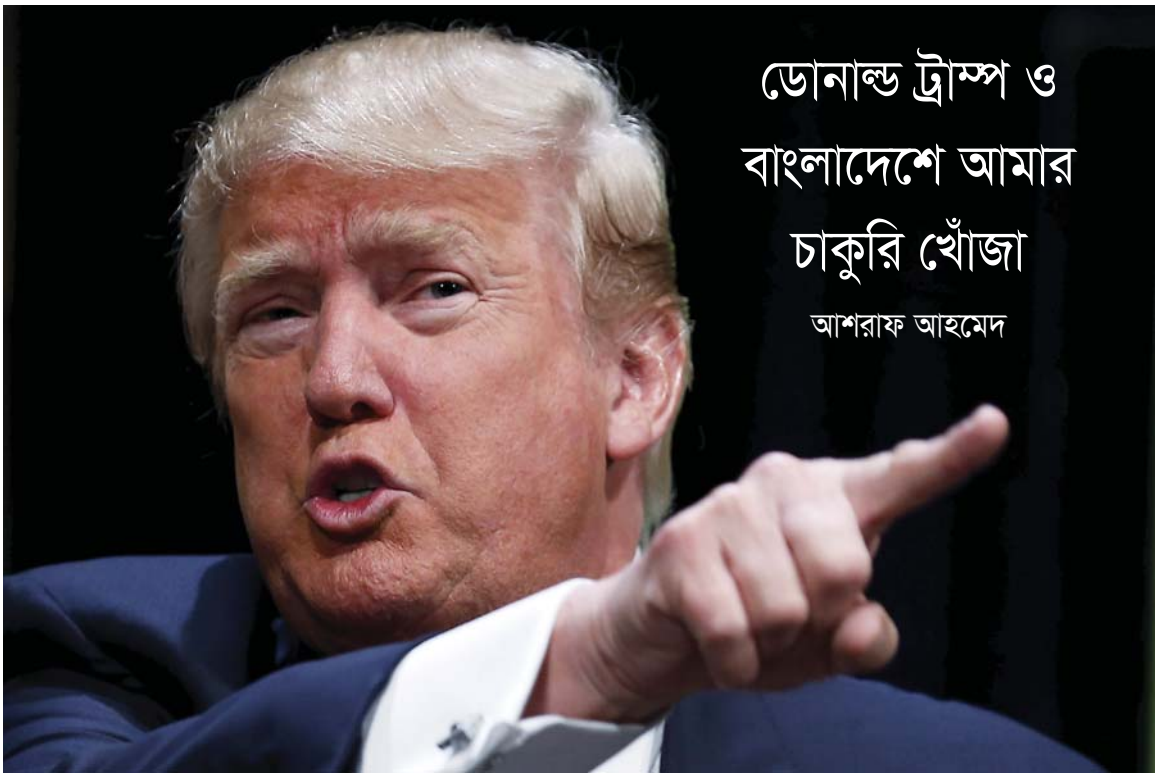

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বাংলাদেশে আমার চাকুরি খোঁজা

আশরাফ আহমেদ

আমেরিকার আগামী নির্বাচন নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঙ্কার শুনে শুনে মনে হচ্ছে আর শান্তিতে থাকা যাবে না। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাই দেশে গিয়েছিলাম। খালি গেলেই তো হবে না, কিছু করে খেতে হবে তো!

কে একজন খবর দিল ঢাকায় 'ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' নামে এক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের পদটি মাত্র খালি হয়েছে। বললো, তাড়াতাড়ি গেলে চাকুরিটা পেয়েও যেতে পারি। বেসরকারি ইউনিভার্সিটিকে বাংলাদেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলা হয়। গেলাম সেখানে। কিন্তু ইন্টারভিউর নামে অনেক গল্পগুজব করে, একতলা থেকে আটতলা পর্যন্ত উঠানামা করিয়ে, চায়ের সাথে দামী বিস্কুট খাইয়ে, সাথে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তুলে, চাকুরি সম্পর্কে কিছুই না বলে ওরা আমাকে বিদায় দিতে গেল। সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, চাকুরিটা আমি পাচ্ছি তো? ওরা বললো, না মানে, ইয়ে মানে আপনার সব অভিজ্ঞতাই আছে, কিন্তু প্রাইভেট পড়ানোর অভিজ্ঞতা তো নেই। আর বুঝতেই তো পারছেন এটি একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, হেঁ হেঁ হেঁ তাই ...।

ভাবলাম আমেরিকায় দুই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে পড়িয়েছি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়িয়েছি প্রাণরসায়ন বিভাগে, অনেক লেকচার দিয়েছি। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই একটা হিল্লে হয়ে যাবে। ওরা বললো তোমার বর্তমান অভিজ্ঞতার একটি পরীক্ষা হয়ে যাক! একটি ক্লাশে দাঁড়িয়ে প্রায় একঘণ্টা লাগিয়ে সারা জীবনে যা যা শিখেছি তা গড়গড় করে বলে গেলাম। বিশ্বাস করুন, একটুও আটকাই নি! কারণও ছিল, সবাই ঘুমাচ্ছিল বলে আমার বলতে কোন বাধাই ছিল না! তাছাড়া ভাবলাম, ইন্টারভিউ বোর্ডের প্রধান আমার অতি ঘনিষ্ঠ ও পুরনো বন্ধু। এইবার চাকুরিটি আমার ঠেকায় কে? কিন্তু ছাত্ররা (হয়তো মনে মনে) বললো, আপনার মান্ধাতা আমলের পড়ানোর পদ্ধতিকে বড়জোর গলাবাজি বলা যায়! পাওয়ার পয়েন্ট, ভিডিও ছাড়া আজকাল কেউ ক্লাশ নেয় নাকি?

আরেকবার কেউ খবর দিল ভিকারুন্নেসা নুন স্কুলে অস্থায়ী ও খণ্ডকালীন বিজ্ঞান শিক্ষকের একটি পদ খালি হয়েছে। ভাবলাম এটি একটি স্কুল, তাও মেয়েদের, এখানে খণ্ডকালীন চাকুরিটি নিশ্চয়ই আমার হবে। বিজ্ঞানী শুনে ওঁরাও খুব খাতিরযত্ন করলেন। সারাটি স্কুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। ছাদে ছাত্রীদের 'গ্রিন ক্লাব'-এর উদ্যোগে বানানো বাগানটি দেখালেন। মজার মজার অনেক কিছু খাওয়ালেন, এবং গানও শোনালেন। চাকুরিটি হয়ে যাবে ভেবে খুশিতে আমি তো ডগমগ!

ঢাকায় বইমেলায় লেখক

কিন্তু তখন বললেন, এবার শুরু হবে আসল ইন্টারভিউ। নিয়ে গেলেন নবম ও দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান ক্লাশে। ভাবলাম এ তো আমার কাছে নস্যি! কিন্তু বাব্বা! এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবা? এতো দেখছি এক বাঘের আস্তানা! একজনের পর একজন ছাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বিজ্ঞানের তুখোড় তুখোড় সব প্রশ্ন করে করে নাস্তানাবুদ করে চলেছিল! ক্লাশের শিক্ষিকা 'এটিই শেষ প্রশ্ন' বলে আমাকে রেহাই দিলে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে কোনরকমে বেরিয়ে এলাম। এসে এতোজন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীর মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিলাম বলে হেডমিস্ট্রেসের সামনে মাথা নীচু করে বসে রইলাম। এরপর কী হলো তা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন!

এবার সিদীপ নামে একটি দেশি এনজিওতে গেলাম। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এরা নানা ধরনের কাজ করেন। ঘরে বাতি জ্বালানো ছাড়াও রান্না, সেচ এবং আরো কী কী প্রয়োজনে সৌরবিদ্যুৎকে কাজে লাগানো যায় সেই চেষ্টা করছেন। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য উন্নয়ন, এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে গ্রামে গ্রামে গোবর-গ্যাস ও গোবর-পিঠা বানানোর কাজ করছেন। মুক্তমনের লেখক-সাহিত্যিকদের নিয়োগ দিয়ে রেখেছেন সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি করতে। 'মানব-সম্পদ' উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। আবার অশিক্ষিত-হতদরিদ্র পরিবারের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিশু সন্তানদের স্কুল থেকে দেয়া 'বাড়ির কাজ' বা হোমওয়ার্ক শেষ করতে দেশব্যাপী এক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।

ভাবলাম সূর্যের মত বিশাল শক্তি এবং গরুর মত প্রকাণ্ড জন্তুকে আমার মত ছোট দেহটি সামাল দিতে পারবে না। আবার সৃজনশীল কিছু করতে গিয়ে কলম বা কি-বোর্ডটিই ভাঙা হবে শুধু। আর প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজে আমি যে অপারগ তার প্রমাণ আগের তিনটি ইন্টারভিউতেই হয়ে গেছে। কিন্তু একটি দরিদ্র পরিবারের অবুঝ শিশুকে পড়াতে নিশ্চয়ই পারবো। এখানে নিশ্চয়ই তেমন বিদ্যার কোন প্রয়োজন নেই!

ওরা বললো হয়ে যাক তোমার পরীক্ষা, শুনি তোমার কথা। শ্যামলীতে 'সিদীপ'-এর সাততলা নতুন ভবনটির প্রশস্ত সম্মেলন কক্ষে আমাকে নিয়ে গেলেন। চারিপাশে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় চল্লিশজন কর্মকর্তা শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। দুরুদুরু বক্ষে কখনো মেঝের দিকে কখনো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি দেড়ঘণ্টা ধরে মনে যা যা ধরে তাই বলে গেলাম। এবার ওঁদের প্রশ্ন করার পালা। কিন্তু কী আচর্য! অনেকটা 'চাঁদটা কেন বাড়ে কমে, সূর্য কেন ওঠে?' 'ভগবানের রূপ কী, কোথায় থাকেন?', 'বিজ্ঞান কি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে?' এই ধরনের আজেবাজে প্রশ্ন করলেন! অর্থাৎ চাকুরি না দিতে যা-যা প্রশ্ন করতে হয় তাই করলেন। কিন্তু ছাত্র বা শিশু পড়ানোর ব্যাপারে কেউ কোন টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না!

আমার মনটি সত্যিই ভেঙে গেল! সবাই বললো, এদেশে তোমার কোন আশাই নেই। তুমি বরং তোমার ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশেই ফিরে যাও।

কিন্তু এতো সহজে হার মানার পাত্র তো আমি নই! বললাম, বিদ্যায় না হোক, শারীরিক কাজ করেতো আমি নিশ্চয়ই কিছু উপার্জন করতে পারি! ওরা বললো, না তেমন শক্তি তোমার দেহে নেই। বললাম, কেন তোমাদের কাপড় কেচে দিতে পারি, ইস্তিরি করে দিতে পারি। তোমরা আগে দেখ আমি পারি কি না। তারপর না হয় মন্তব্য কর। তথাস্তু বলে সবাই এলো আমার সাথে ব্যান্ডবক্স নামের এক ধোপাবাড়িতে।

সবার প্রখর দৃষ্টির সামনে প্রথমেই কাপড়গুলোর সূতা, বুনন এবং রঙ দেখে দেখে আলাদা করে ফেললাম। নির্ধারিত ধোয়ার মেশিনে ভিন্ন ভিন্ন সাবান, স্পিরিট বা শ্বেতীকরণ ও রং উজ্জ্বলকারী রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে কাপড়গুলো ধুয়ে ফেললাম। কাপড় বুঝে আধুনিক সেন্ট্রিফিউজে শুকিয়ে

ফেললাম নিমেষে। সূক্ষ্ম কিছু কাপড় পাঁচতলার ছাদে হাতে ধুয়ে রোদে শুকাতে দিলাম। পুড়ে না যায় তা মাথায় রেখে একাগ্রচিত্তে একটি কোটও ইস্তিরি করলাম। সাথে থাকা মহিলারা বললো, কিন্তু আমাদের তো দরকার শাড়ি ইস্তিরি, সেটি কী করে করবে? তখন নক্সা করা শাড়ি ইস্তিরি করে দেখালাম। ভাঁজও করলাম। বললো, শার্ট, কোট, শাড়ি এসব তো খুব হালকা। ভারি কাপড় কি তুলতে পারবে? ধোয়া কম্বলগুলো একটার ওপর একটা সাজিয়ে রেখে হাতের পেশীর যে জোর আছে তার প্রমাণ দিলাম।

মালিক বললেন, আমরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় এখানকার বাথরুম পরিষ্কার করাই এবং তা সুপারভাইস করি। তুমি কি তা করতে পারবে? কী বলে, কী বলে? মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। এখানে তো আমার কাপড় ধোয়ার কথা, তা বাথরুম ধোয়া কেন? আর বাসার মত এখানে তো কাপড় বাথরুমে ধোয়া হয় না! তাহলে? আমাকে সোজা পেয়ে সব কাজ করিয়ে নিতে চায় নাকি? পরক্ষণেই মনে হলো চাকুরিটি আমার চাই। তাই মনের প্রশ্নটি প্রকাশ না করে বলে ফেললাম, পারবো। আবার বললেন, প্রতিদিন আমাদের পঞ্চাশটি শোরুমের প্রতিটি থেকে কত হাজার কাপড় এলো, কোন কাপড়টি যেকোন মুহূর্তে ধোপাঘরের কোন স্তরে আছে, তার হিসাব কি রাখতে পারবে? অঙ্কে আমি খুব কাঁচা। তার ওপর এই বয়সে সব কথা সবসময় মনেও থাকে না! তা জেনেও বললাম, পারবো। বললেন, বাগানের পরিচর্যা করতে পারবে তো? ভাবলাম, ফুল আমি ভালবাসি। কাজেই খুশি মনে এর হ্যাঁ উত্তর দিতে আমার বেগ পেতে হয়নি। মনে হলো মালিক খুব খুশি হয়েছেন। বললেন, চল ওপরে অফিসে গিয়ে তোমার চাকুরির আর শর্তগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

যেতে যেতে বললেন, তুমিতো আবার আমেরিকার মত ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে এসেছো! কিন্তু ধোপাবাড়িটি আমরা অনেকটা সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালাই। এখানে নারী-পুরুষ, অতি শিক্ষিত থেকে স্বল্পশিক্ষিত, আঠারো থেকে আশি বয়সের সব ধরনের লোকই কাজ করে। সবাইকে সমান সম্মান করা হলেও অভিজ্ঞতা বুঝে বেতন নির্ধারিত হয়। কিন্তু ছোটদের প্রতি বড়দের কর্তব্যের কথা প্রতিদিন স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। বেতন ছাড়াও আছে বার্ষিক ছুটি, বোনাস, অবসরে যাওয়ার প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পিকনিক। আর সবার জন্য আছে বাধ্যতামূলক দশ দিনের আনন্দ-ভ্রমণের ছুটি ও ভাতা। পরীক্ষায় ভাল ফল করা কর্মচারীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দিতে বৃত্তি ও পড়ার খরচ দেয়া হয় প্রতিবছর। এছাড়া রয়েছে ঈদ, বড়দিন, পূজা ও বৌদ্ধ পূর্ণিমার বোনাসসহ ছুটি। রোজার ইফতারিতে প্রতি সন্ধ্যায় আড়াই সের দুধ এবং আড়াই সের ওজনের ফজলি আম দেয়া হয় প্রত্যেককে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে। কর্মচারী ও পরিবারের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা আছে। কারো কোন কঠিন রোগের চিকিৎসা, যেমন মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পুরো খরচ আমরাই বহন করি। চাকুরিরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে পুরো পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে নেই।

তারপর বললেন, এখানে তোমার চাকুরি হলে তুমিও এইসব সুবিধা পাবে। তবে ট্রাফিক জ্যাম বা বাসে ভিড় বলে চাকুরিতে দেরি করা আমরা একেবারেই সহ্য করি না। এখান থেকে হাঁটা-দূরত্বে কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা করা আছে এই ধোপাবাড়ি থেকেই। কর্মচারীরা এক তৃতীয়াংশ ভাড়া দেয়, বাকিটা দেই আমরা। প্রয়োজনে তুমি এখানেই থাকতে পারবে।

মালিক এসব কথা বলছিলেন আমার সাথে হাসিমুখেই। সাথের সবাইও আমার সাথে ভাল ব্যবহারই করছিলেন। তার ওপর বেতন, থাকা-খাওয়া, ওষুধ-ডাক্তার, এবং বিশেষ করে আম ও দুধের যে লোভ দেখালেন তাতে আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। আহা, কত বছর, কত যুগযুগান্ত থেকে আমি ফজলি আম খাই না। তার সাথে খাঁটি দুধ! এসব এখন আমার হাতের মুঠোয়! কার বাপের সাধ্যি এই চাকুরিটি আমার ঠেকায়?

এবার সিদীপ নামে একটি দেশি এনজিওতে গেলাম। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এরা নানা ধরনের কাজ করেন। ঘরে বাতি জ্বালানো ছাড়াও রান্না, সেচ এবং আরো কী কী প্রয়োজনে সৌরবিদ্যুৎকে কাজে লাগানো যায় সেই চেষ্টা করছেন। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য উন্নয়ন, এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে গ্রামে গ্রামে গোবর-গ্যাস ও গোবর-পিঠা বানানোর কাজ করছেন।

মনের আনন্দে সবার আগে আগে আমি এগিয়ে চললাম। এখানে যে চাকুরির খোঁজে এসেছি তা পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে একটি ডিঙিয়ে আরেকটি সিঁড়িতে পা দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। মাঝেমাঝে পানির ঝরনা ও দেয়ালে লাগানো সুন্দর ম্যুরালের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম।

অফিস ঘরটি বড় ও প্রশস্ত। অতিথি ও দর্শনপ্রার্থীর বসার জন্য টেবিলের সামনে নরম গদির সোফা। মালিক বললেন, বস। আত্মবিশ্বাস তখন আমার সাত আসমান ছাড়িয়ে গেছে! আমি এক ছুটে টেবিলের ওপাশে সবচেয়ে ভাল রিভলভিং চেয়ারটিতে গিয়ে বসে পড়লাম। বসেই কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলাম। হায় হায় করে সবাই আমার দিকে ছুটে এলো। বললো, কোথায় বসেছো, এটা কী করছো, ওঠ এক্ষুণি, বেরিয়ে যাও এখান থেকে ...।

নাহ্, এই চাকুরিটিও আমার হলো না। এভাবে সাতদিন বাংলাদেশে কাটিয়ে ডোনাল্ড ভাইয়ার বকা খেতে আবার আমেরিকায় ফিরে এলাম।*

*যে অভিজ্ঞতাগুলো এখানে বর্ণনা করেছি তার সবই সত্যি, কিন্তু আমার বদ অভ্যাসের কারণে তাতে হাস্যরস আনতে চেয়েছি। তাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের কারণে আমার চাকুরি খোঁজার কাল্পনিক কথা জুড়ে দিয়েছি, এবং বর্ণনাকারীকে কাল্পনিক অপমান করেছি। তাতে কোন চরিত্রের আহত হওয়ার কোন কারণ নেই।

আসলে দেশে গিয়েছিলাম হঠাৎ করে কয়েক ঘণ্টার সিদ্ধান্তে, মাতৃতুল্য আমার বড়বোনের মহাপ্রয়াণে। যে-যে কর্মকর্তার কথা লিখেছি তাঁরা আমার অতি আপনজন। স্থানগুলোতে যাওয়া হয়েছিল তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরই আমন্ত্রণে এবং আয়োজনে। তারা নিতান্তই দয়ালু বলে অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োগ করে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সবশেষে আবার বিশেষণীয় বিশেষণের হাততালিতে আমাকে সিক্ত করেছেন। বাংলাদেশে থাকার সাতটি দিন ও রাত্রি তারা আমাকে আন্তরিকভাবে যে সময় ও সাহচর্য দিয়েছেন, যেভাবে আপ্যায়ন করেছেন এবং যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, পৃথিবীর খুব কম লোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সেসবের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই।

২৮ মার্চ ২০১৬

আশরাফ আহমেদ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে একজন বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত।

ফেসবুক থেকে

সিদীপ মডার্ন স্কুলকে যেভাবে দেখি

অনিল চন্দ্র পাল

শিক্ষা জাতির উন্নতির মূল চাবিকাঠি। জাতীয় উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হলো শিক্ষা। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। যুগে যুগে যারা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে এসেছেন তাঁদের মূল চালিকা শক্তি শিক্ষা।

আমি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করি। আমার পরলোকগত পিতাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অবসর গ্রহণ করার পর ২ বছর আমি একটি কে.জি. স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলাম। সেখানে দেখা গেলো ভর্তি, বেতন ও বইয়ের বোঝা নিয়ে দুর্বল ও হতদরিদ্র পরিবারের শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে।

২০১৬ সালে আমি সিদীপ মডার্ন স্কুল মাইজদী ক্যাম্পাসে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করি। উক্ত সংস্থার ভর্তি ফি, মাসিক বেতন ও স্বল্প মূল্যে বই বিক্রি দেখে আমার খুবই ভালো লাগল। এখানে শ্রেণী অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ের আকার সীমিত রয়েছে। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এমনকি হতদরিদ্র পরিবারের সন্তানগণও পড়ার সুযোগ পায়। স্থানীয় অভিভাবকগণ উৎসাহিত হয়ে শিশুদের অত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। যার ফলে প্রথম বছরেই আমার স্কুলে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৬ জন। বর্তমান বর্ষে প্লে, নার্সারী, কে.জি ও প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত খোলা হয়। নোয়াখালী শহরের এক প্রান্তে প্রধান সড়কের পাশে বিদ্যালয়টি আকর্ষণীয় স্থান দখল করে আছে। অত্র বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিদীপ মাইজদী শাখা অফিসের কর্মকর্তা, মনিটরিং অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ ও সকল কর্মকর্তা আন্তরিকভাবে বিদ্যালয়ের কাজে বেশ সহযোগিতা করেন। আমি আশা করি অচিরেই বিদ্যালয়টি একটা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে সিদীপ সংস্থার মুখ উজ্জ্বল করবে। বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী দিবসে স্থানীয় অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ অনেক লোকের সমাগম হয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করায় এলাকাবাসী খুবই আনন্দিত।

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ স্কুল ছুটির পর অনুপস্থিত শিশুদের অনুপস্থিতির কারণ বাড়ি পরিদর্শন ফরমে পূরণ করেন।

অভিভাবকের স্বাক্ষর নিয়ে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেন। আমার সহকারী শিক্ষিকাগণ বেশ ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট উপকরণ নিয়ে শ্রেণীতে পাঠদান করেন। পাঠ পরিকল্পনা তৈরিতে আমি তাদের সার্বিক সহযোগিতা করে থাকি। প্রদর্শনী পাঠ দিয়ে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে থাকি।

সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম

শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আমাদের বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিও আছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রায় সকল অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকার পাশাপাশি সিদীপ অফিস মাইজদী শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদেরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও সিদীপ অফিসের লোকজন নিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী শিশুদের পুরস্কৃত করা হয়।

এ বছর স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ২৫ জন শিশুকে নিয়ে সকল শিক্ষকসহ ২৫শে মার্চ শুক্রবার ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় শহীদ ভুলু স্টেডিয়ামে মহড়ায় যোগ দেই। পরদিন ২৬শে মার্চ সকাল ৭ ঘটিকার সময় ঐ ২৫ জন শিক্ষার্থী ও সকল শিক্ষক স্টেডিয়ামে যান। ২৫ জন শিক্ষার্থী কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে পুরস্কার লাভ করে। সেখানে জেলার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাদেরও পুরস্কৃত করা হয়।

লেখক সিদীপ মডার্ন স্কুলের (মাইজদী ক্যাম্পাস, নোয়াখালী) প্রধান শিক্ষক

সিদীপের নববর্ষ উদযাপন

মো: জাহিদুল ইসলাম

পহেলা বৈশাখে প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ভোরের হাওয়া, গাছের পাতা, ফুল, পাখিসহ উৎসবে মেতে উঠে পুরো বাঙালি জাতি। হতাশা-গ্লানি আর পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে সম্ভাবনার নতুন দিনের প্রত্যয়ে প্রাণের উচ্ছ্বাসে গেয়ে উঠে– 'নব আনন্দে জাগো আজি নব রবি কিরণে।' বাঙালি জাতি নানা আয়োজন আর উৎসবের মাধ্যমে বৈশাখকে বরণ করে নেয়। বর্তমানে বর্ষবরণ উৎসব বাঙালি জাতির অন্যতম জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা, নৌকা বাইচ, গ্রাম্য খেলাধুলা, সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে বর্ষবরণ উদযাপন করা হয়।

সিদীপের (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস) নাচ-গান-অংকনের স্কুল 'প্রস্ফুটনে'র আয়োজনে ১৩ এপ্রিল ২০১৬ (৩০ চৈত্র ১৪২২) সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত কাজকর্মের পাশাপাশি বর্ষবরণ উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে সবার একত্রে চিড়া, মুড়ি, খই, কলা, দই, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে সকালের নাস্তা গ্রহণের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের জন্য সংস্থার সম্মেলন কক্ষটি বৈশাখের বিভিন্ন ফেস্টুন, ছোট-বড় আকৃতির রঙ্গিন ঘুড়ি, রং-বেরংয়ের বেলুন, মুখোশ, ডিজিটাল ব্যানার ইত্যাদি দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়।

সবাই মিলে দুপুরের খাবার খেয়ে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার নাঈমা খাতুন, মিসেস আবদুল্ল্যাহ্, রাবেয়া নাজনীন, সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, স্বপন চন্দ্র শীল, মো: ইকবাল হোসেন, প্রণব মণ্ডল, মো: জাহিদুল ইসলাম পলাশ, মো: জাহিদুল ইসলাম, পপি রানী সাহা, বিএন নাজমুন আমীন ও সোনিয়া পারভীন মিলে দলীয়ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "এসো হে বৈশাখ, এসো এসো ..." গানটি পরিবেশনা করেন। এরপর প্রস্ফুটনের শিল্পীরা "আমরা সবাই রাজা আমাদের এ রাজার রাজত্বে ..." গানটি পরিবেশন করে।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ্, নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, পরিচালক (প্রোগ্রাম) ফজলুল হক খান, উপ-পরিচালক ফরিদ উদ্দিন, ডিজিএম মো. আ. কাদির সরকার, ডিজিএম সেখ সেলিম, এজিএম (ফিন্যান্স) একেএম শামসুর রহমান, এজিএম (প্রোগ্রাম) মো. রফিকুল ইসলাম ভূঞা, ম্যানেজার (স্পেশাল প্রোগ্রাম) মো. তারিকুল ইসলাম, এ্যাসি. ম্যানেজার (ফিন্যান্স) সচ্চিদানন্দ দাস, সিনিয়র এডমিন অফিসার নাঈমা খাতুন এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান।

দলীয়ভাবে "আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা ..." এবং "আহা, আজি এ বসন্তে এতো ফুল ফুটে ..." গান দুটি পরিবেশন করা হয়। এছাড়া মো: জাহিদুল ইসলাম পলাশ, মো: জাহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী এবং রুবেল আহমেদ নেওয়াজ মিলে

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করছেন সংস্থার সভাপতি

'জলের গান' ব্যান্ডের "বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কানও বান্ধাইলি ..." গান পরিবেশন করেন। সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সহ-সভাপতি জনাব শাহজাহান ভূঁইয়া সুরেলা কণ্ঠে কিশোর কুমারের "সে তো এলো না, সে এলো না, কেন এলো না জানি না...." গানটি গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন মো. তারিকুল ইসলাম, আব্দুর রউফ ও মো. জাহিদুল ইসলাম পলাশ। এছাড়াও প্রস্ফুটনের খায়রুল ইসলাম, ফাহমিদা করিম ও সৈকত একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কৌতুক পরিবেশন করেন মো. তাজুল ইসলাম ও ব্যঙ্গ ছড়া বলেন মো. মাইনুল ইসলাম।

গান গেয়ে শোনাচ্ছেন সংস্থার সহ-সভাপতি

অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন একাউন্টস অফিসার রাবেয়া নাজনীন। প্রস্ফুটনের গানের শিক্ষক জনাব খায়রুল ইসলাম ও তবলা শিক্ষক মনসুর আহমেদের সার্বিক সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি বেশ উপভোগ্য হয়। শেষে পরিচালক (প্রোগ্রাম) ফজলুল হক খান সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন এবং চমৎকার পরিবেশনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। সাথে সাথে নতুন বাংলা বছরে সকলের মঙ্গল কামনা করেন। সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ্ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নতুন বাংলা বছরে আমরা হিংসা-বিদ্বেষ, হতাশা-গ্লানি ভুলে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে সংস্থা ও ব্যক্তি জীবনকে আরো সুন্দর ও সার্থক করবো।

বৈশাখী উপহার হিসেবে বন্ধুপ্রতিম সংস্থার পক্ষ থেকে পাঠানো মিষ্টি ও পিঠা খেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

ভালোবাসা একবারই হয়

শ্যামল দত্ত

আবির ল্যাপটপ ওপেন করেছে মাত্র। ঠিক তখনই এলো ফোনটা– আবির, কী করছিস?

: অফিসে কাজ করছি। আজ তোর স্যুটিং নেই?

: আরে স্যুটিং স্পট থেকেই তো তোকে ফোন করছি। প্লিজ চলে আয়, জরুরি দরকার।

: হঠাৎ আমাকে তোর কী দরকার হলো?

: দরকারটা আমার চেয়ে আমার স্যুটিং ইউনিটেরই বেশি।

: মানে?

: তোকে অভিনয় করতে হবে।

: অভিনয়?

: হ্যাঁ, আজ আমার সাথে যার অভিনয় করার কথা ছিলো, সে আর এক সিডিউলে ফেঁসে গেছে।

: অভিনেতা ফেঁসে গেছে বলে কি তুই আমায় ফাঁসিয়ে দিবি?

: কেন, তুই তো অভিনয় করেছিস। কলেজে সেরা অভিনয়ের জন্য পুরস্কারও পেয়েছিলি। ...

নীলা আবিরকে ওর কলেজের সেই দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। সত্যিই তো, কলেজে অভিনয়ই ছিলো আবিরের ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু জীবনটা কলেজের সেই স্বপ্নের দিনগুলোর মতো নয়। মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। কর্মজীবনে আবির এখন কমার্শিয়াল এ্যাডভার্টাইজিং অফিসের ভিজ্যুয়ালাইজার। আর কলেজ জীবনে আবিরের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকা সেই নীলা এখন মিডিয়ার ব্যস্ত অভিনেত্রী। জীবনে দুজনের দুটি আলাদা পথ তৈরি হয়ে গেছে। অবশ্য বন্ধুত্বটা সময়ের স্রোতে একেবারে হারিয়ে যায় নি। এখনও টিকে আছে। পুরনো বন্ধু বলে ফোনে ওদের মাঝে-মধ্যে 'হাই-হ্যালো' হয়, ব্যস ওই পর্যন্তই। কিন্তু আজ হঠাৎ সেই নীলার ফোন পেয়ে আবির যেন মুহূর্তের মধ্যে অন্য মানুষ হয়ে গেলো। কলেজের পুরনো দিনগুলো যেন ছবির মতো ভেসে উঠলো চোখের সামনে। আর যেন বেজে উঠলো গানের সেই কলি: সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি। ...

তন্ময়তা ভেঙে গেলো। আবারও নীলার ফোন– কীরে, আসছিস তো? ...

নাটকে নীলার স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করতে হলো আবিরকে। খুবই ছোট একটা চরিত্র। সংলাপও তেমন নেই। কিন্তু অভিনয়ের একটা অংশ খুবই চমৎকার। স্বামী তার স্ত্রীকে অবহেলা করে চলে যাচ্ছে, আর ঠিক তখন স্ত্রী স্বামীর হাতে হাত রেখে বলছে, আমাদের চার বছরের বিবাহিত জীবনে তুমি কি একবারও আমায় ভালোবাসো নি? স্ত্রী চরিত্রে নীলা স্বামী আবিরের হাতে হাত রেখেছে। প্রশ্নও করেছে। সংলাপটা যদিও নাটকের, কিন্তু আবিরের কেন যেন হঠাৎ মনে হলো– প্রশ্নটা নীলা ওকেই করেছে।

নাটকের ওই মুহূর্তে নীলার সংলাপ শুনে আবিরের চোখ ভিজে উঠেছিলো। আর একটু হলেই বোধহয় চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তো। কিন্তু তখনই নাটকের পরিচালক চিৎকার করে বললেন, 'কাট!' চমকে উঠেছিলো আবির। ওর খারাপ অভিনয়ের জন্য দৃশ্যটা কেটে বাদ দেবে নাকি? নীলার সামনে ও তাহলে মুখ দেখাবে কী করে? আবির যখন এ সব কথা ভাবছে, তখন পরিচালক হাসতে-হাসতে এগিয়ে এলেন। বললেন, আপনি তো প্রফেশনাল আর্টিস্টকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন ভাই!

নাটকের স্ক্রিপ্ট হাতে ওপাশ থেকে নীলা বললো, আর্টিস্ট সিলেকশনে আমি তাহলে ভুল করি নি নিশ্চয়ই?

: নেভার, কোনও নতুন শিল্পীর কাছ থেকে এ রকম অভিনয় আশাই করা যায় না।

: ক্যামেরার সামনে আবির নতুন হতে পারে কিন্তু অভিনয়ে সে আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র।

: রিয়েলি!

সবাই যখন আবিরের অভিনয়ের প্রশংসায় ব্যস্ত, আবির তখনও ডুবে আছে ওই সংলাপে। নাটকের ওই মুহূর্তটির কথা ও তখনও ভেবে চলেছে। আচ্ছা, নাটকের চরিত্রের মতো নীলা যদি সত্যি-সত্যিই ওই প্রশ্নটা আবিরকে করতো, 'তুমি কি একবারও আমায় ভালোবাসো নি'– তাহলে কী উত্তর দিতো আবির? নীলা কি শুধুই ওর বন্ধু, বন্ধুত্বের বাইরে নীলাকে কি এক মুহূর্তের জন্যেও ওর ভালো লাগে নি? ...

এ রকম হাজার কথা ভাবতে-ভাবতে কীভাবে যে জীবন থেকে চারটে বছর হারিয়ে গেছে, আবির বোধহয় বুঝতেই পারে নি। তবে ওদের পুরনো বন্ধুত্বের সম্পর্কটা আরও নিবিড় হয়েছে। এখন এমন একটা দিন নেই যে ওদের মধ্যে

অন্তত তিন থেকে চার বার ফোনে কথা হয় না। কিন্তু এই চার বছরে ঘটনা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। স্যুটিংয়ে অনুপস্থিত অভিনেতার ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে আবির অভিনয়ে জড়িয়ে পড়েছে। আর ব্যস্ত অভিনেত্রী নীলা অভিনয় প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। নীলা এখন বিদেশে পাড়ি জমাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। এটাই এখন ওর ধ্যান-জ্ঞান, সব। আবিরের সাথে এ সব বিষয় নিয়ে প্রায়ই নীলার কথা হয়। নীলা বলে, আমি বাইরে কোথাও সিটিজেনশিপ পেয়ে গেলে ধরে নে তুইও বাইরে চলে গেছিস।

: কীভাবে?

: বা-রে, তুই আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তোকে ছাড়া আমি আমার কোনও বিষয় ভাবতে পারি?

নীলার কথা শুনে আবির হেসেছে, কিছু বলে নি। এরপরও কি কিছু বলার থাকে? শুধু রঙিন একটা স্বপ্নের জাল বুনেছে মনে মনে। এ রকম স্বপ্ন নীলাও দেখতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই! ...

একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে খুব ভোরে আবিরের আজ ঘুম ভেঙেছে। ভালো করে তখনও ভোরের আলো ফোটে নি। তবু বিছানা থেকে উঠে পড়লো আবির। ফুল স্পিডের ফ্যানের নিচে ও তখন ঘেমে অস্থির। অনেকে বলে, ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। কিন্তু এ রকম একট স্বপ্নের ভাবনা তো আবির অনেক দিন আগেই মনে মনে ভেবে রেখেছে। স্বপ্নে বিসমিল্লাহ্ খানের সানাইয়ের সুরটা যেন এখনও কানে বেজে চলেছে। আর ফুলে-ফুলে সাজানো বাসরঘরে জামদানি শাড়ির ঘোমটার নিচে মুখ লুকিয়ে বসে থাকা নীলা! বরের পোশাকে আবিরও ওর মুখোমুখি। কারও মুখে কথা নেই। আবির হঠাৎ নীলার হাত দুটো তুলে নেয় হাতে। মেহেদির চমৎকার নকশায় আঁকা নীলার হাত দুটো ধরে বলে– একবার নয়, আমি বার বার তোমাকেই ভালোবাসবো!

কলিংবেলের টুংটাং আওয়াজ। দরজা খুলে আবিরের এবার সত্যিই অবাক হওয়ার পালা, নীলা তুই!

: তোকে সারপ্রাইজ দেবো বলে চলে এলাম।

: আরে আমিও তো একটা দারুণ কথা শোনাবো বলে তোকে ফোন করবো ভাবছিলাম।

: কী কথা?

: একটা স্বপ্নের কথা।

: কিন্তু আমারটা স্বপ্ন না, সত্যি।

: কী সত্যি?

: আরে কানাডায় আমার যে কাজিন থাকে, কাল রাতে ওর সাথে আমার এনগেজমেন্ট হয়ে গেলো।

: মানে?

: ব্যাপারগুলো যে এতো তাড়াতাড়ি ঘটবে ভাবতে পারি নি, তোকেও জানাতে পারি নি।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁ, আরও কী হয়েছে জানিস?

: কী?

: যার নাম শুনলে আমার এ্যালার্জি হতো, শেষ পর্যন্ত তাকেই বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেলাম!

: তাহলে এ্যাডজাস্ট করবি কীভাবে?

: এ্যাডজাস্ট তো কাল রাত থেকেই শুরু হয়েছে।

: মানে?

: এনগেজমেন্ট হওয়ার পর থেকেই ভাবছি, আমি বোধহয় মনে-মনে এতো দিন ওকেই ভালোবেসেছি।

কথা বলতে-বলতে নীলা আবিরের হাতে হাত রাখে। নীলার হাতে মেহেদির নকশা আঁকা দেখে আবারও চমকে ওঠে আবির। নীলা লজ্জা পেয়ে বলে, 'এ সব মিলার কাণ্ড। আচ্ছা, সত্যি করে বল্ তুই কাউকে কোনোদিন ভালোবেসেছিস?'

কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না আবির। শুধু মনে-মনে বলে, ভালোবাসা একবারই হয়!

লেখক একজন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে একটি ব্রাঞ্চ ভাল রাখার কৌশল

শান্ত কুমার দাস

আমরা যারা মাইক্রোক্রেডিটে কাজ করি প্রত্যেকে চাই আমার ব্রাঞ্চটি ভাল থাকুক। ভাল রাখার জন্য আমরা যে যেভাবে বুঝি কাজ করে থাকি। কর্মী থেকে শুরু করে কেউ চাই না ব্রাঞ্চটি খারাপ হোক। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু ব্রাঞ্চ খারাপ হয়ে পড়ে অথবা খারাপের দিকে যেতে থাকে। তবে মাইক্রোক্রেডিটের অভিজ্ঞতায় বলে, একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (বিএম)-এর উপর একটি ব্রাঞ্চের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। একজন বিএম ইচ্ছা করলে একটি ব্রাঞ্চকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে একটি ব্রাঞ্চকে ধ্বংস করতে পারেন। একজন বিএম যদি আন্তরিকতা এবং দক্ষতা দিয়ে কাজ করেন তাহলে একটি খারাপ ব্রাঞ্চও মডেল ব্রাঞ্চে রূপান্তরিত হতে পারে। আবার অনেকে আন্তরিকভাবে কাজ করেও গুছিয়ে কাজ না করার কারণে ব্রাঞ্চের অগ্রগতি ঘটাতে পারেন না এবং তাকে ভালোর দিকে নিয়ে যেতে পারেন না। তাই একটি ব্রাঞ্চ ভাল রাখার জন্য নিম্নে কিছু বিষয় উপস্থাপন করা হল:

১। ব্রাঞ্চের স্টাফদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক: বিএম ও ব্রাঞ্চের স্টাফদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক কেমন তা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি বোঝা যায় তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ভাল না, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সকল সহকর্মীদের নিয়ে বসে সকল ধরনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বিএম-এর পক্ষে সমাধান করা সম্ভব না হলে প্রয়োজনে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (আরএম)-কে বিষয়টি অবগত করে সমাধানের ব্যবস্থা নিতে হবে। কোন অবস্থায় তা দীর্ঘায়িত করা যাবে না। মনে রাখতে হবে ব্রাঞ্চের কর্মীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ভাল না থাকলে কোন কাজ ভাল হবে না এবং ব্রাঞ্চের কোন অগ্রগতি হবে না। এই ক্ষেত্রে বিএম যত পরিশ্রমই করুক না কেন ব্রাঞ্চের ক্ষতি ছাড়া কোন অগ্রগতি হবে না।

বিএম-কে ব্রাঞ্চের সকল কর্মীদের সাথে ভাল সম্পর্ক তৈরি করতে হবে, তাদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে হবে এবং সকলকে সমানভাবে দেখতে হবে। তাদের সকল সমস্যা নির্ভয়ে যাতে শেয়ার করতে পারে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাহলেই ব্রাঞ্চে একটি টিমস্পিরিট তৈরি হবে এবং ব্রাঞ্চের অগ্রগতি নিশ্চিত হবে।

২। সমিতি পরিদর্শন: আমাদের সকল কর্মকাণ্ড সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হয়। তাই সমিতি ঠিক না থাকলে সকল কর্মকাণ্ডে ব্যঘাত ঘটে। বিএম-কে ব্রাঞ্চের সকল সমিতি চেনা এবং নিয়মমাফিক পরিদর্শন করা, কোন বিএম বদলি হয়ে ব্রাঞ্চে যোগদানের পর যত দ্রুত সম্ভব সমিতিগুলো চেনা এবং সকলের সাথে পরিচিত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সমিতি না চেনা পর্যন্ত তিনি কর্মীদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না। একটি ভুল সিদ্ধান্ত দেয়া হলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার খেসারত দিতে হবে। শুধু খেসারত না, ব্রাঞ্চে সমস্যা দেখা দিলে সমস্ত কাজে তার প্রভাব পড়ে, কোন কাজ সঠিক সময়ে করা যায় না এবং ব্রাঞ্চ অল্প দিনের মধ্যে এলোমেলো হয়ে যায়। বিএম-কে ব্রাঞ্চের সকল সমিতি নিয়মমাফিক ৩ মাসের মধ্যে অবশ্যই পরিদর্শন করতে হবে। বিএম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমিতি পরিদর্শন না করলে ঐ সমিতিগুলোতে অনিয়মের আশ্রয় হয় এবং কর্মীরা অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে। প্রতি মাসে বিএম-কে পরিকল্পনা মাফিক সমিতি পরদর্শন করতে হবে এবং যে সকল সমিতি পরিকল্পনা মাফিক পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি তা চিহ্নিত করে রাখতে হবে। তৃতীয় মাসে যে সমিতিগুলো পরিদর্শনের আওতায় আসেনি সেগুলো অবশ্যই পরবর্তীতে পরিদর্শন করতে হবে।

সকল সমিতি পরিদর্শন শেষে সমিতিগুলোকে ৩টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে হবে। ভাল সমিতিগুলোকে 'এ' ক্যাটেগরি, একটু খারাপগুলোকে 'বি' ক্যাটেগরি এবং খারাপ সমিতিগুলোকে 'সি' ক্যাটেগরিতে ভাগ করে নিজে নিজে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে পর্যায়ক্রমে সকল সমিতিকে 'এ' ক্যাটেগরিতে নিয়ে আসতে হবে।

বিএমকে সমিতি 'পরিদর্শন করার জন্য পরিদর্শন' না করে কার্যকরভাবে সমিতি পরিদর্শন করতে হবে। পরিদর্শনের পর যাতে সমিতিটি অন্তত ৩ মাস ভাল থাকে। কর্মীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমিতি পর্যায়ে অনিয়ম করে থাকে। তাই সমিতি পরিদর্শনের সময় বিএম যদি অনিয়ম ধরতে না পারেন তাহলে তারা বড় ধরনের অনিয়ম করার সাহস পাবে। সমিতি পরিদর্শনের সময় খুঁটিনাটি সকল বিষয় দেখতে হবে। সমিতিতে বিএমকে যা দেখতে হবে নিম্নে তা দেয়া হল:

ক) সদস্যরা সময়মত উপস্থিত হয় কিনা।

খ) সমিতি পরিচালনার সকল উপকরণ আছে কিনা।

গ) উপস্থিতির হার ভাল কিনা। যদি ভাল না থাকে বুঝতে হবে উক্ত সমিতিতে এক হাতে একাধিক ঋণ রয়েছে।

ঘ) এক হাতে একাধিক ঋণ থাকলে তা চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করতে হবে যাতে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়া যায়।

ঙ) অগ্রিম সঞ্চয় ও অগ্রিম কিস্তির টাকা সদস্যরা সমিতিতে কর্মীর কাছে জমা দিয়েছে/জমা দেয় কিনা।

চ) কর্মী সময়মত ঋণ প্রস্তাব করে কিনা।

ছ) মাঠে যে সঞ্চয় উত্তোলন দেয়া হয়েছে তা শীটের সাথে ঠিক আছে কিনা।

জ) পাশ বই-এর ব্যালেন্স ও কালেকশন শীটের ব্যালেন্স মিলকরণ। যদি গড় মিল থাকে তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া।

ঝ) সমিতিতে কোন ভুয়া ঋণ আছে কিনা।

৩। পরিকল্পনা তৈরি করা: পরিকল্পনা ব্রাঞ্চের অগ্রগতির একটি হাতিয়ার। পরিকল্পনা তৈরি করার পূর্বে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ফান্ডের প্রাপ্যতা এসবের উপর নির্ভর করে বিএম-কে ঠিক করতে হবে আগামী ৬ মাস অথবা এক বৎসরে ব্রাঞ্চটিকে কোথায় নেয়া যাবে। একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ব্রাঞ্চের সকল কর্মীদের সাথে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করে, তার মতের সাথে সকলের মত সমন্বয় করতে হবে। সকলে একমত পোষণ করার পর ব্রাঞ্চের লক্ষ্য অনুযায়ী যার যার রেজিস্টারভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। পরিকল্পনা তৈরির নিয়মগুলো ভালভাবে আলোচনা করতে হবে, প্রয়োজনে হাতেকলমে শিখিয়ে দিতে হবে যাতে বাস্তবায়ন সন্তোষজনক হয়।

পরিকল্পনা তৈরির পর প্রতিদিন পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিদিন ফলোআপ না করা হলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয় না। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করা গেলে ব্রাঞ্চের অগ্রগতি সাধিত হবে না। কোন কর্মী পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যগুলো অর্জন না করতে পারলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪। নতুন সদস্য ভর্তি: নতুন সদস্য ভর্তি ব্রাঞ্চের একটি চলমান প্রক্রিয়া। ভাল সদস্য ভর্তি না করতে পারলে কার্যক্রম ভাল চলবে না এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ পণ্য ক্রয়ে যদি লাভ না হয় বিক্রিতে লাভ হবে না। তাই ভাল সদস্য ভর্তি করার জন্যই সবসময় চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে সদস্য ভর্তির জন্য কর্মীরা সমিতির উপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এতে করে সদস্যরা তাদের সমমানের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে ভর্তি করার জন্য নিয়ে আসে, আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদের আত্মীয়-স্বজন নিয়ে এসে ভর্তি করে নিজেরা ঋণের টাকা ভোগ করে, ফলে এক হাতে একাধিক ঋণ চলে যায়, পরবর্তীতে সমিতিতে সমস্যা দেখা দেয়। সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে সমিতির উপর নির্ভর না করে নিজেরা যোগাযোগ করে ভর্তি করতে পারলে অনেকটা নিরাপদ থাকা যায়। তাছাড়াও ভাল সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের বিকল্প নেই। অনেক ক্ষেত্রে কর্মীরা নিজেরা যাচাই-বাছাই করে সদস্য ভর্তি করে নিয়ে আসে এবং বিএম না দেখে ভর্তির অনুমোদন দিয়ে থাকেন। ফলে কিছু কিছু ভুল সদস্য ভর্তি হয়ে যায়, পরবর্তীতে তারাই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী যদি সদস্য ভর্তি করা হয় তাহলে অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী একজন নতুন সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে যে ভাবে যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন নিম্নে তা দেয়া হল:

ক) কোন সদস্য ভর্তি হতে আসলে অথবা কোন সদস্যকে কর্মী ভর্তি করতে চাইলে কারো সহযোগিতা না নিয়ে নিজে নিজে সদস্যর বাড়ি খুঁজে বের করে তার বাড়ি-ঘর, প্রকল্প, আয়ের উৎস এবং তার স্বামীর বর্তমান পেশা কি ইত্যাদি জেনে আশেপাশের লোকদের সাথে আলোচনা করে যদি ভর্তির উপযুক্ত হয় তাহলে সদস্য ভর্তির যাচাই ফরমে তার যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর, তারিখ এবং আইডি নং লিখে বিএম-এর কাছে জমা দিতে হবে।

খ) বিএমকে এক সপ্তাহের মধ্যে যাচাই ফরমটি নিয়ে কারো সহযোগিতা না নিয়ে ঠিকানা অনুযায়ী নিজে নিজে আশেপাশে জিজ্ঞাসা করে সদস্যর বাড়িতে যেতে হবে। এর মধ্যেই উক্ত সদস্য সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাবে। সদস্যর বাড়ি-ঘর যাচাই করে এবং কর্মী কর্তৃক সকল তথ্য ঠিক আছে কিনা দেখে যদি ভর্তি করার উপযুক্ত হয় তাহলে যাচাই ফরমে প্রাথমিক অনুমোদনের ঘরে স্বাক্ষর, তারিখ ও আইডি নং লিখে কর্মীর কাছে ফেরত দিতে হবে। ভর্তি না করা গেলে লাল কালি দিয়ে এক টানে কেটে দিতে হবে।

গ) কর্মীকে পরবর্তী সপ্তাহে সমিতির সদস্যদের সাথে আলোচনা করে রেজুলেশনের মাধ্যমে এবং ভর্তি ফরম পূরণ করে সদস্যকে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

এভাবে একজন সদস্য ভর্তি করা হলে খারাপ সদস্য ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকবে।

৫। ঋণী সদস্য যাচাই: ঋণ কার্যক্রমে ঋণী যাচাই একটি

গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজটি যে যত ভালভাবে করতে পারে তার ব্রাঞ্চ তত ভাল থাকে। ঋণী সঠিকভাবে যাচাই বাছাই না করতে পারলে ব্রাঞ্চে সমস্যা দেখা দিবেই। তাই ঋণী যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো দেখা প্রয়োজন নিম্নে তা দেয়া হল:

ক) নতুন সদস্য ভর্তির দিন বিকালে তার বাড়িতে গিয়ে বাড়ি-ঘরের অবস্থা, স্বামীর বর্তমান প্রকল্প, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, পরিবারের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ, তার ও স্বামীর চরিত্র, সামাজিক অবস্থা, অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে কত টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে, এলাকার মধ্যে তার কোন ঋণ আছে কিনা এবং তার লেনদেন কেমন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কত টাকা ঋণ দেয়া হলে ভালভাবে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারবে এসব খসড়া ঋণ প্রস্তাবের অপর পৃষ্ঠায় লিখে এবং সদস্যর প্রাথমিক তথ্য পূরণ করে বিএম-এর কাছে জমা দিতে হবে।

খ) পুরাতন সদস্যদের ক্ষেত্রে যখনই তার ৩০/৩৫ সপ্তাহ উত্তীর্ণ হবে, ঐ দিনই কর্মীকে বিকালে তার বাড়িতে গিয়ে বাড়ি-ঘরের অবস্থা, স্বামীর বর্তমান প্রকল্প, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, পরিবারের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ, তার ও স্বামীর চরিত্র, সামাজিক অবস্থা, অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে কত টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে, এলাকার মধ্যে তার কোন ঋণ আছে কিনা, বিগত বৎসর কিভাবে লেনদেন করেছে, সমিতিতে উপস্থিতি কেমন ছিল এবং সমিতির নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি ঋণ দেয়া যায় তাহলে কত টাকা ঋণ দেয়া হলে ভালভাবে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারবে তা খসড়া ঋণ প্রস্তাবে লিখে এবং সদস্যর প্রাথমিক তথ্য পূরণ করে আবেদনের পিছনে কি কি দেখেছেন এবং কোন প্রকল্পে কত টাকা ঋণ দিতে চান তার মন্তব্য লিখে স্বাক্ষর, আইডি নং ও তারিখ লিখে বিএম-এর কাছে জমা দিবেন।

গ) বিএমকে গত সপ্তাহের জমাকৃত খসড়া ঋণ প্রস্তাবগুলো নিয়ে কারো সহায্য ছাড়া নিজে নিজে সদস্যর বাড়িঘর সরেজমিনে যাচাই করে কর্মী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করে এবং আশেপাশের লোকজনের সাথে আলোচনা করে বিভিন্নভাবে খোঁজখবর নিয়ে ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করে খসড়া ঋণ প্রস্তাবের পিছনে 'সদস্যর বাড়িঘর সরেজমিনে যাচাই করেছি' এবং 'কর্মী কর্তৃক প্রদেয় তথ্য ঠিক আছে' লিখতে হবে। সদস্যর সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে কত টাকা ঋণ দেয়া যায় তার পরিমাণ লিখে প্রাথমিক অনুমোদন দিয়ে স্বাক্ষর, আইডি নং ও তারিখ লিখে কর্মীর কাছে ফেরত দিতে হবে।

ঘ) বিএম-এর প্রাথমিক অনুমোদনকৃত খসড়া ঋণ প্রস্তাবগুলো সবসময় কর্মীর কালেকশন ব্যাগে রাখতে হবে। যে দিন সদস্যর ঋণ পরিশোধ হবে ঐ দিনই সমিতিতে সদস্যদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত ঋণ প্রস্তাব করে রেজুলেশন খাতায় লিখতে হবে। এতে করে সদস্যদের সময়মত ঋণ পেতে কোন সমস্যা হবে না। সদস্যদেরকে সময়মত ঋণ দিতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হয় এবং অন্য দিকে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়। তাই সদস্যদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিকতা বৃদ্ধি করার জন্য সময়মত ঋণ প্রদান করা নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) যে সকল সদস্যকে ঋণ বিতরণ করা হবে তাদেরকে দুপুর ১টার মধ্যে অফিসে উপস্থিত করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীর উপস্থিতিতে বিকাল ৩টার মধ্যে বিতরণ কাজ শেষ করতে হবে। মনে রাখতে হবে সদস্যদেরকে দেরি করে বিতরণ করা হলে তারা বিরক্ত হবে, ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিকতা কমবে এবং ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে। যদি কোন কারণে ঋণ দিতে দেরি হয় তাহলে তাদের সাথে খারাপ আচরণ না করে বুঝিয়ে বলতে হবে।

৬। দুপুরে ফিল্ড থেকে ফেরা: ব্রাঞ্চের সকল কর্মীদেরকে দুপুর ১.৩০মি.-এর মধ্যে কালেকশন শেষ করে অফিসে ফিরে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে কর্মীরা অফিসে ফিরে না আসলে যে সকল কাজের ক্ষতি হয় নিম্নে তা দেয়া হল:

ক) সঠিক সময়ে ব্যাংকিং করা যাবে না।

খ) সদস্যদেরকে সঠিক সময়ে ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

গ) সঠিক সময়ে দুপুরের খাবার খাওয়া যাবে না।

ঙ) দুপুরে বিশ্রাম করার সুযোগ থাকবে না।

চ) সঠিক সময়ে বিকালে মুভমেন্ট করা যাবে না, ফলে নতুন সদস্য ভর্তি ও ঋণী যাচাই করা যাবে না।

৭। কর্মী-উন্নয়ন: শাখায় কর্মরত কর্মীরাই বিএম-এর হাতিয়ার, কর্মীরা যদি সঠিকভাবে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে তাহলে সকল কাজই ভাল হবে এবং ব্রাঞ্চের অগ্রগতি হবে। তাই ব্রাঞ্চে কর্মরত সকল কর্মীর মূল্যায়ন করে দুর্বল কর্মী চিহ্নিত করতে হবে। যদি কোন কর্মী কাজে দুর্বল হয় তাহলে বিএম তার সাথে খারাপ আচরণ না করে তার প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে প্রয়োজনে হাতে ধরে কাজ শিখাতে হবে। এর ফলে একদিকে যেমন কাজের গতি বাড়বে

অন্যদিকে বিএম-এর সকল আদেশ-নির্দেশ কর্মী আন্তরিকভাবে পালন করার জন্য চেষ্টা করবে। অনেক চেষ্টা করার পরও যদি কোন কর্মীর কাজ শেখার আগ্রহ না বাড়ে এবং কাজের গতি না বাড়ে তাহলে তাকে বাদ দেয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮। অনিয়ম না করা: সকল নিয়ম-কানুন পালন করে ঋণ দেয়ার পর যদি কোন কারণে কোন সদস্যর কিস্তি সকল ধরনের চেষ্টা করেও আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে বকেয়া দেখানোর জন্য কর্মীকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে এবং সাথে সাথে এরিয়া ম্যানেজারকে কিস্তি অনাদায়ের বিষয়টি অবগত করতে হবে। কোন অবস্থায় বকেয়া গোপন করে কর্মীদের পকেট থেকে টাকা নেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, একটি অনিয়ম থেকে ১০টি অনিয়ম জন্ম নেয়। কর্মীরা কখনো পকেট থেকে টাকা দেয় না; তারা ১ টাকা পকেট থেকে দিলে ১০ টাকা অনিয়ম করে নিজের পকেটে নিয়ে যায়। তাছাড়াও বিএম যদি কোন কর্মীকে অনিয়ম করার নির্দেশনা দেন, তাহলে উক্ত কর্মীর প্রতি বিএম সবসময় দুর্বল থাকবেন এবং কোন সময় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। এক সময় উক্ত কর্মী বড় ধরনের যে কোন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তাই কোন অবস্থায় কোন ধরনের অনিয়ম করা ঠিক হবে না।

৯। ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সশীট করা: ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সশীট অনিয়ম রোধ করার একটি হাতিয়ার। এই কাজটি সঠিক নিয়মে করা হলে কর্মীরা কোন অনিয়ম করার সুযোগ পাবে না। যদি কোন কর্মী অনিয়ম করে থাকে তাহলে ব্যালেন্স চেকিং-এর সময় ধরা পড়বে। ব্যালেন্স চেকিং করার সময় এক কর্মীর পাশবই অন্য কর্মীকে দিয়ে ক্রস চেক করা হলে ভুল ও অনিয়ম থাকলে ধরা পড়বে। এই সময় বিএমকে প্রতিটি পাশবই যাচাই করে স্বাক্ষর দিতে হবে।

১০। সদস্যর উপস্থিতিতে লেনদেন করা: সদস্যর উপস্থিতি ছাড়া ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে না। টাকা উত্তোলনের পর যদি কোন কারণে সদস্য অফিসে না আসে তাহলে সম্পূর্ণ টাকাই হাতে নগদ থাকবে, এতে করে ঝুঁকি বাড়বে। কোন কর্মী অনিয়ম করে যদি ভুয়া ঋণ নিতে চায় তাহলে কর্মী বিএম-কে বলতে পারে- স্যার আমার সদস্য আসতে একটু দেরি হবে, টাকাটা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে রাখেন। কর্মী জানে বিএম বিকাল ৪টার সময় বৈকালিক কর্মসূচিতে ফিল্ডে চলে যাবেন, তখন কর্মী বলবে- স্যার টাকাটা আমার কাছে দিয়ে যান, সদস্য আসলে বিতরণ করে ফিল্ডে চলে যাব। পরবর্তীতে মাস্টার রোলে ডান হাতে-বাম হাতে স্বাক্ষর করে নিজে কিস্তি পরিশোধ করতে থাকে। কিছু দিন যাওয়ার পর সদস্য পলাতক বলে চালিয়ে দিয়ে বকেয়া দেখাতে শুরু করে। তাই সকলের উপস্থিতিতে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। সাপ্তাহিক স্টাফ মিটিং: সাপ্তাহিক স্টাফ মিটিং ব্রাঞ্চের কর্মী-উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। বর্তমানে ব্রাঞ্চগুলোতে মিটিং-এর নামে শুধু রেজুলেশন লেখা হয়ে থাকে। এতে ব্রাঞ্চের কোন উপকার হয় না। তাই বিএম-কে অনেক গুরুত্ব সহকারে মিটিংটি করতে হবে। মিটিংয়ে যে সকল আলোচনা করতে হবে নিম্নে তাহা দেয়া হল:

ক) গত সপ্তাহের সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে হবে, যদি কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হয়ে থাকে তাহলে কেন হল না তার কারণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

খ) কর্মীভিত্তিক সাপ্তাহিক প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করে সপ্তাহের কর্মসূচির অগ্রগতি/অবনতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যদি অবনতি হয়, কেন হয়েছে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে।

গ) সাপ্তাহিক লক্ষ্য অর্জন নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যদি কোন কর্মীর লক্ষ্য অর্জন না হয়ে থাকে কেন হল না তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে রেজুলেশন খাতায় লিখতে হবে। আগামী সপ্তাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

ঘ) বিএম-এর গত সপ্তাহের সমিতি পরিদর্শনের উপর আলোচনা করতে হবে, সমিতিতে কি কি ঘাটতি ছিল এবং কি সমস্যা ছিল তা আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হবে এবং পরবর্তী সপ্তাহে তা ফলোআপ করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঙ) ব্রাঞ্চে যদি কোন সমস্যা থাকে তা নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

চ) সকল কর্মীর সাথে আলোচনা করে আগামী সপ্তাহের ঋণ বিতরণের জন্য বারভিত্তিক সেটিং তৈরি করতে হবে।

একজন বিএম যেভাবে কাজ করলে ব্রাঞ্চটি ভাল থাকবে মূলত এ বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকেই উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো লিখেছি। ব্রাঞ্চগুলোতে এভাবে কাজ করা হলে একটি ভাল ব্রাঞ্চ হবেই।

লেখক সিদীপের ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)

মুরগির হাসি দেখেছেন আবুল হাসেম

মনজুর শামস

বাংলাদেশে প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে পোল্ট্রি শিল্প এক বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। পোল্ট্রি শিল্প প্রাণী সম্পদ খাতের একটি উপখাত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলেছে এই শিল্প। ডিম ও মাংস সরবরাহ করে দেশের প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে এর অবদান পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করেছে। ২০১২ সালে পরিচালিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষার হিসেব অনুযায়ী সে বছর দেশের জিডিপিতে এর অবদান ছিল ২ দশমিক ৬৭ শতাংশ। ২০১৫ সালে ঢাকার বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে ওয়ার্ল্ড পোল্ট্রি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের এক সেমিনারে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে এ শিল্পের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি অক্ষুণ্ন থাকলে ২০১৮ সালের মধ্যে এ দেশ থেকে পোল্ট্রি-পণ্য রফতানি হবে। আর এ শিল্পের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৮ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত করতে পারলে ২০৩০ সালের মধ্যে মুরগির মাংসই হবে বাংলাদেশের এক নম্বর মাংস। ২০২০ সালের মধ্যে এ শিল্পে প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এই অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশ শাখার সভাপতি মসিউর রহমান বলেন, মুরগির ডিম ও মাংস হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ, সস্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রোটিন। একটি গরুর যেখানে খাদ্যোপযোগী হয়ে উঠতে কম করে হলেও দেড় বছর লাগে, একটি ছাগলের ৭ থেকে ৯ মাস এবং মাছ খাবার উপযোগী হতে প্রকারভেদে ৪ থেকে ৯ মাস লেগে যায়, সেখানে একটি মুরগি মাত্র ৩০-৩২ দিনে খাদ্যোপযোগী হয়ে ওঠে। এই সেমিনারে বিশ্বের ২৩টি দেশের প্রতিষ্ঠান, গবেষক ও বিজ্ঞানীরা অংশ নিয়েছিলেন। এমন সম্ভাবনাময় খাত হওয়া সত্ত্বেও ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারি

পর্যায়ে এ শিল্পের তেমন অগ্রাধিকার নেই। তাই বেসরকারি খাতের উদ্যোগই এখন ভরসা। একটি হিসেবে দেখা গেছে দেশে মাসে প্রায় আড়াই কোটি ডিম এবং ২৬ লাখ কেজি মুরগি উৎপাদিত হচ্ছে। অনেক সমস্যা উতরে যারা প্রতিনিয়ত এই শিল্পে সম্ভাবনার বীজ বুনে চলেছেন সেই খামারিদের জীবনের কথা জানতে কুমিল্লায় যাই।

ময়নামতি ইউনিয়নের সমসপুর গ্রামে যখন পৌঁছলাম সূর্য তখন মাথার ওপরে উঠে গেছে। একটি নির্মাণাধীন টিনের ঘরের তদারকি করছিলেন আবুল হাসেম। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। সিদীপের ময়নামতি শাখার ব্যবস্থাপক জনাব শাহজাহান আমাদের আসার উদ্দেশ্য জানানোর পর আমি তার মুরগির শেডগুলোর ছবি তুলতে চাইলাম। আমাকে কিছুটা হতাশ করে হাসেম জানালেন, তার বাড়ির শেডগুলো এখন প্রায় খালি। এখানে সোনালি কক মুরগি তুলেছিলেন। কয়েকদিন আগে সব বিক্রি করে দিয়েছেন। এরপর ভরসা দিয়ে বললেন, রাস্তার ওপারে অন্য একটি গ্রামে দুটি শেড ভাড়া নিয়ে সেখানে লেয়ার মুরগি তুলেছেন। সেখানে যাওয়া যেতে পারে। সম্মতি জানাতেই তিনি আগে আগে হাঁটতে শুরু করলেন, পিছু পিছু আমরা দুজন।

রাস্তা পেরিয়ে একটি সবজি ক্ষেতের আল ধরে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলাম আমরা। সবজি ক্ষেত পার হয়ে একটি বড় পুকুর পড়ল হাতের ডানদিকে। পুকুরের ওপর বাঁশের খুঁটি পুঁতে সারা পুকুরের ওপর নাইলনের জাল টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। কুমিল্লার প্রায় সব পুকুরেই এমন দৃশ্য দেখা যায়। শাহজাহান সাহেব জানালেন, পুকুরে যাতে গাছের পাতা পড়তে না পারে এবং পাখি যাতে ছোঁ মেরে মাছ খেতে না পারে সেজন্যই এ ব্যবস্থা।

মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই তার লেয়ার মুরগির শেডে পৌঁছে গেলাম। যথারীতি জীবাণুনাশক ওষুধ গোলানো পানিতে পা ধুয়ে শেডে ঢুকে পড়লাম। হাসেম মুরগির লম্বা খাঁচার সামনে বিছিয়ে থাকা ডিম তুলতে থাকলেন আর আমি ছবি

তুলতে লাগলাম। দুটি শেডে ঢুকেই ছবি তুললাম। এরপর আমরা আবার তার বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

আবুল হাসেমের বাড়িতে পৌঁছে তার মুখোমুখি বসে আলাপ শুরু করলাম। প্রথমেই জানতে চাইলাম পোল্ট্রি খামার কবে, কেন এবং কীভাবে শুরু করলেন। জানালেন– সৌদি আরবে গিয়েছিলেন ১৯৯৮ সালে। ফিরে এসে ২০০৬ সালে বিদেশের টাকায় প্রথমে মাছ চাষ শুরু করেন। নিজের একটি পুকুরসহ আরো দুটি পুকুর ভাড়া নিয়ে পাঙ্গাস ও রুইমাছের পোনা ছেড়েছিলেন। বিদেশ থেকে উপার্জন করা সব টাকাই মাছচাষে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম থেকেই মাছ চুরি হয়ে যেত বলে লোকসান দিতে থাকেন। প্রথম ৬ মাসেই বিদেশের সব আয় গচ্চা দিয়ে আরো ৬ লাখ টাকা ঋণ করেন বিভিন্নজনের কাছ থেকে। এ সময়ের ভেতর তিনি শুনেছেন এবং দেখেছেন মুরগির খামারে লাভ বেশি। তাই ২০০৭ সালে ৫ হাজার টাকা খরচ করে ১ হাজার লেয়ার মুরগির বাচ্চা কিনে মুরগির খামার শুরু করেন। ৬ মাস পর তার মুরগিগুলো ডিম দিতে শুরু করে। মুরগি ডিম দেয়া শুরু করার পর প্রথম মাসেই তিনি ২০ হাজার টাকার ডিম বিক্রি করেন। তখন খরচ বাদে মুরগির খামার থেকে তার মাসে ৩ হাজার টাকা লাভ থাকত। ৩ বছর পর তিনি মাছচাষ পুরোপুরি বন্ধ করে দেন।

এর পর থেকে তিনি শুধু মুরগির খামারেই মনোযোগ দিতে থাকেন। সারাক্ষণ তিনি মুরগির নিবিড় পরিচর্যাতেই কাটাতে থাকেন। এর সুফলও পেতে থাকেন। ধীরে ধীরে লাভের অঙ্ক বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে খামারের পরিধিও। এখন তিনি প্রতিদিন ৭ হাজার টাকার ডিম বিক্রি করেন। নিজস্ব শেড রয়েছে দুটি। নতুন আরেকটি তৈরি করছেন। আরো দুটি শেড ভাড়া নিয়েছেন। তিনি নিয়মিত মুরগির টিকা দেন এবং শেডগুলোর জৈব নিরাপত্তার দিকটা খুব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। ভালো করেই জানেন, এ ব্যবসার সবচেয়ে বড় ঝুঁকি রোগবালাই।

তিনি বর্তমানে তিন ধরনের মুরগি পোষেন– লেয়ার, ব্রয়লার ও সোনালি কক (দেশি মুরগির সঙ্গে লেয়ারের ক্রসব্রিডিং)। এই তিন ধরনের মুরগির ভেতরে লেয়ারে লাভ থাকে সবচেয়ে বেশি। প্রতিদিনই নগদ টাকায় ডিম বিক্রি করা যায়। ব্রয়লার মুরগিতে মওসুম ভেদে তার আয়ে তারতম্য ঘটে। পিকনিক, বিয়ে এবং ঈদের মওসুমে লাভ থাকে বেশি। সেসব মওসুমে মাসে কম করে হলেও ৫০ হাজার টাকা লাভ থাকে। খারাপ মৌসুমে এই লাভের পরিমাণ অনেক কমে যায়। তখন মাসে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা লাভ হয়।

তিন রকমের মুরগিকে তিন রকমের খাবার খাওয়াতে হয়। ওষুধও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। ১ হাজার ব্রয়লার মুরগির পেছনে ওষুধ ও খাবার বাবদ দৈনিক ৭ হাজার টাকা খরচ হয়। ১ হাজার লেয়ার মুরগির জন্য রোজ খাবার ও ওষুধ বাবদ ৪ হাজার টাকা খরচ করতে হয়। আর ১ হাজার সোনালি মুরগির পেছনে দৈনিক খরচ হয় ১ হাজার ৯ শ টাকা।

তিন ধরনের মুরগি মিলে বর্তমানে তার গড়ে মাসিক আয় ১ লাখ টাকা। প্রথম ছয় মাসে মাছ চুরির কারণে সব মূলধন খুইয়ে তাকে যে ৬ লাখ টাকা ঋণ নিতে হয়েছিল এর মধ্যেই তা পরিশোধ করেছেন। ২০০৭ সালে তিনি সিদীপ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন ২০ হাজার টাকা, ২০১৪ সালে নিয়েছিলেন ২ লাখ এবং ২০১৫ সালে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা। সিদীপ থেকে তিনি শুধু টাকা ঋণই নেননি। সেখানে সঞ্চয়ও করছেন। এ সংস্থায় ২০১০ সালে খুলেছেন ডিপিএস, একই বছর খুলেছিলেন সাধারণ সঞ্চয় হিসাব আর ২০১৪ সালে খুলেছেন স্বেচ্ছা সঞ্চয় হিসাব।

তার বাবা মারা গেছেন অনেক আগেই। বিয়ে করেছেন ১৯৯৫ সালে। তার স্ত্রীর নাম হাসিনা বেগম। তারা ছিলেন দুই ভাই। মা এখনো জীবিত। সাংসারিক জীবন বেশ সুখেই কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই তাতে ছন্দপতন ঘটে। ২০০৪ সালে ছোট ভাইকে সৌদি আরবে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে ২০১০ সালে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সে নিহত হয়। তার ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে। বড় ছেলে মেহেদি হাসান (১৩) ক্লাস নাইনে পড়ে। মেজ ছেলে হাসিবুল (৭) মাদ্রাসায় পড়ে। ছোট ছেলে আবুল বাসারের বয়স সবে দেড় বছর। একমাত্র মেয়ে ঝুমা (৯) ক্লাস ফোরে পড়ে।

তিনি তার মুরগির খামারে দুজন লোক খাটান। ভবিষ্যতে তার এই খামার আরো অনেক বড় করার ইচ্ছে রয়েছে। এতকাল লেয়ার মুরগিতে বেশি লাভ করে এলেও বর্তমানে ব্রয়লার ও সোনালি ককেই অকে সময় বেশি লাভ থাকছে। জানালেন, লাখ পাঁচেক টাকার সংস্থান করতে পারলে ১০ হাজার সোনালি কক বা ব্রয়লার মুরগি তুলতে পারবেন। তখন তার মাসে কম করে হলেও আড়াই লাখ টাকা লাভ থাকবে। আয় আরো বাড়লে ভবিষ্যতে আবারো মাছ চাষের ইচ্ছে রয়েছে।

তিনি যেভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন তাতে তার স্বপ্ন সফল হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

লোক-ঐতিহ্যের আলোকে উদ্ভাসিত পাবনা জেলা

আজাদ এহতেশাম

বাংলাদেশ গ্রাম-প্রধান একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাঙালির সমৃদ্ধ একটি নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে যার ভিত্তিমূলে আছে এ দেশের পঁচাশি হাজার গ্রাম ও গ্রামের মানুষ। এই গ্রামের মানুষের সংস্কৃতিই হল আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি। যদিও এখন অনেকে নগর সভ্যতার চাকচিক্যময়তা ও বিজাতীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে বেশি আগ্রহী তবুও ঐতিহ্যের আলোকে লোকসংস্কৃতি চর্চা এখনও অপ্রতুল নয়– একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবু এ কথা সত্য যে দ্রুত বিশ্বায়নের যুগে আকাশ-সংস্কৃতির কালো থাবায় গ্রামীণ সংস্কৃতি অনেকটাই কোণঠাসা। অথচ আমাদের মেধা-মননে, চলনে-বলনে নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন লোকসংস্কৃতিকে জানা ও এর চর্চা। এক্ষেত্রে ড. আশরাফ পিন্টুর 'পাবনা জেলার লোক-ঐতিহ্য ও স্থাননাম' গ্রন্থটি আমাদেরকে কিছুটা সহযোগিতা করবে।

পাবনা অত্যন্ত পুরনো একটি জেলা যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৮ সালে। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রশাসনিক সুবিধার কারণে এ অঞ্চলকে পাঁচটি প্রদেশ ও ২৮টি জেলায় রূপান্তর করেছিলেন। তখন বৃহত্তর পাবনা জেলাকে ঢাকা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বেশ কয়েকবার তিনি এ রূপান্তর প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিলেন। তৃতীয়বারে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলার একাংশ নিয়ে পাবনা জেলা গঠিত হয়।

গ্রন্থটির অধ্যায় বিভাজনে লেখক দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে পাবনা জেলার গঠন, অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, জনসংখ্যা, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, নদনদী, জনজীবন, পাবনা জেলার গুণী ব্যক্তিবর্গ, পাবনা জেলাকে নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ, পাবনা জেলার পত্রপত্রিকা, পাবনা জেলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ইত্যাদি। প্রতিটি অনুচ্ছেদে লেখকের অনুপুঙ্খ আলোচনা ও প্রামাণিক তথ্য ও যুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত বিষয় পাঠকচিত্তে এক ধরনের কৌতূহল সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পাবনা জেলার লোকঐতিহ্য। এ জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাজারও লোকঐতিহ্য। লোকসংস্কৃতির প্রধান দুটি ভাগ: এক,

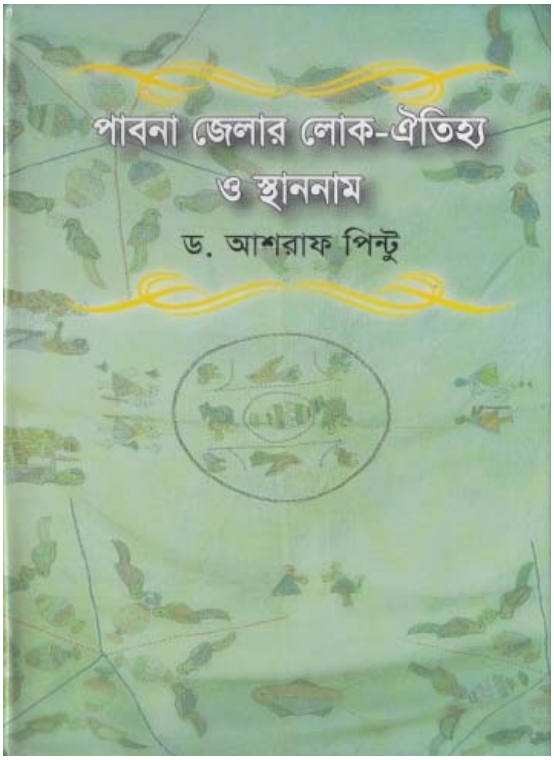

লোকসাহিত্য বা শিল্পধর্মী লোকসংস্কৃতি। এ ধারার মধ্যে লেখক ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, মন্ত্র, লোকসংগীত, জারিগান, সারিগান, ভাটিয়ালি, বাউল গান, মেয়েলিগীত, লোককথা, লোকোৎসব ইত্যাদি সম্বন্ধে সরস ও প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন।

লোকসংস্কৃতির অপর শাখা হলো বস্তুধর্মী লোকসংস্কৃতি। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে নানা উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। কুটিরশিল্পজাত এ সকল কিছু লোকসংস্কৃতিরই অংশ। এ অংশে লেখক আলোচনা করেছেন বাঁশ ও বেতের তৈরি কুলা, চালুন, ঝাঁকা, চাঙারি, তালাই ডোল, মাথাল, টুকরি, টোনা, টোপা, মুরগির খাঁচা, পাখির খাঁচা, পলো, দোয়াই (চারো) কাঠা, তালের আঁশের খেলনা ঝুড়ি, তালপাতার পাখা ও বিভিন্ন নকশি কাঁথা ইত্যাদি। ছবির সাথে সাথে এগুলোর পরিচিতি আমাদের ক্ষণিকের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে যায় সুশীতল ছায়াবিথীতলের গ্রামীণ জনজীবনে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পাবনা জেলার স্থাননাম। প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী স্থাননাম কোন অঞ্চলের ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে। সে বিবেচনায় গ্রন্থকার প্রথমে পাবনা জেলার ৯টি উপজেলার নামকরণের ইতিহাস ও তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তারপরে তার অধীনস্থ প্রত্যেকটি ইউনিয়নের নামকরণ ও পরিচয় তুলে ধরেছেন। পাবনা

সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন, আটঘরিয়া উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন, ঈশ্বরদী উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন, চাটমোহর উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন, ফরিদপুর উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন, বেড়া উপজেলার উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন, ভাঙ্গুড়া উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন, সাঁথিয়া উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও সুজানগর উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের নামকরণের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এছাড়া পাবনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা/সড়ক, পাড়া-মহল্লার নামকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

স্থানের নামকরণের সঠিক ইতিহাস, তথ্য-উপাত্ত ও প্রামাণিক যুক্তি উপস্থাপন নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ কাজ। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে কখন কীভাবে কোনো স্থান নাম ধারণ করেছে এবং তা কালের প্রবাহমানতায় পরিবর্তিত হয়েছে তার সঠিক ইতহাস জানা কঠিন। তাছাড়া এদেশের লক্ষ লক্ষ স্থানের নামকরণের পেছনে রয়েছে বিচিত্র ইতিহাস, উপাখ্যান, জনশ্রুতি আর কিংবদন্তি। নামকরণের প্রেক্ষাপট খুঁজতে গিয়ে লেখক এসবেরই আশ্রয় নিয়েছেন। আবার বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার শিক্ষিত ও প্রবীণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। বয়সের বিচারে এ সকল তথ্যদাতার বয়স সর্বনিম্ন ৩০ বছর থেকে শুরু করে ৯০ বছরের বৃদ্ধও রয়েছেন। এঁদের প্রদত্ত তথ্য সবটাই সঠিক নয়, কিছুটা অসঙ্গতিও আছে মনে হয়। যেমন, একদন্ত ইউনিয়নের নামকরণে বলা হয়েছে ইসলাম খাঁর প্রেরিত সৈন্য একদণ্ড (কিছু সময়) একদন্ত নামক স্থানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এই একদণ্ড কালক্রমে একদন্ত নামে পরিচিতি পায়। এই তথ্যটি কোথা থেকে আসল তথ্যসূত্রে তার উল্লেখ নাই। ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ফরিদপুরের (বনওয়ারি নগর) জমিদার রায়বাহাদুর হাতিতে চরে পাবনা আসতেন। পথে একদন্ত নামক স্থানে বিশ্রাম নিতেন। এলাকার শতশত মানুষ হাতি এবং জমিদারকে দেখতে আসত। হাতিটির ছিল একটি দাঁত। এটি মানুষের মুখে প্রচার পায় একদাঁতি হাতি হিসেবে। এভাবেই স্থানটির নামকরণ হয় একদন্ত নামে। বহুল প্রচলিত এ তথ্য দিলে ভালো হতো।

সুজানগর উপজেলায় রাণীনগর ইউনিয়ন নামে একটি স্থান আছে। নামকরণে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন নাটোরের জমিদার রাণী ভবাণী এখানে একবার বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে এলাকাবাসী গ্রামের নামকরণ করেছেন রাণীনগর। পরিশিষ্টে তথ্যদাতার নামোল্লিখিত হয়েছে। এই তথ্যটির ঐতিহাসিক সত্যতা কতটুকু? কোন স্বীকৃত গ্রন্থের রেফারেন্স দিলে ভালো হতো। সংশয় ও সন্দেহের দোলাচলে আবিষ্ট পাঠকের আকাঙ্খার নিবৃত্তি ঘটানোর

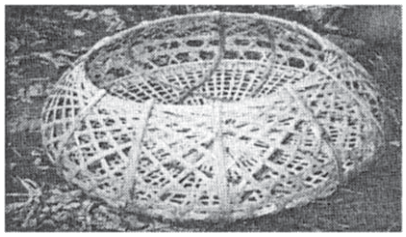

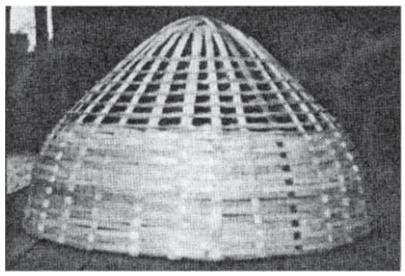

বিষয়টি সর্বোচ্চ বিবেচনায় রাখা দরকার– সেক্ষেত্রে তথ্যসূত্র নির্দেশে আরেকটু যত্নবান হওয়া দরকার ছিলো। তবু নিরলস পরিশ্রম করে এ ধরনের শ্রমলব্ধ একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পেয়েছেন ড. আশরাফ পিন্টু– তাই নিঃসন্দেহে তিনি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

পরিশিষ্টে গ্রন্থকার পাবনার নিজস্ব লোকসংস্কৃতির এক নিখুঁত চিত্র উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি জেলার বা এলাকার নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। এসব সংস্কৃতির আবেদন সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের কাছে চিরন্তন। গ্রন্থকার পাবনা জেলার লোকসংস্কৃতির বিবরণ দিয়েছেন। নিভৃত পল্লীগ্রামে ঘুরে ঘুরে এগুলো সংগ্রহ করা এবং তথ্যদাতা/গায়কের পরিচিতি তুলে ধরা একটি কঠিন কাজ। তবু তিনি তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথেই করেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'পাবনা জেলার লোক-ঐতিহ্য ও স্থাননাম' পাবনা জেলার লোক-সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। সঠিক তথ্য ও উপাত্তের নিরিখে নিখাদ ও ত্রুটিমুক্ত এ ধরনের গ্রন্থ রচনা প্রায় অসম্ভব। তবু এ গ্রন্থের সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে লেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল। বইটির প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে। প্রকাশক গতিধারা। বইটির চাররঙা চকচকে প্রচ্ছদ করেছেন সিকদার আবুল বাশার। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯২। দাম ২৫০ টাকা। বইটি সবার কাছে সুখপাঠ্য হবে। এর বহুল প্রচার কামনা করি।

শিল্পী সাথীর সুস্থতা কামনায় ‘ছন্দিত বর্ণের নিভৃত কথন’

আলমগীর খান

রঙতুলিতে স্বপ্নের জাল বোনা ও জীবনের জয়গান করা যার সাধনা সেই শিল্পী মাসুদা আহমেদ সাথী আজ ঘাতক ব্যাধি ক্যানসারে আক্রান্ত। অসুন্দর, আঁধার ও কুপমন্ডূকতাকে রুখে দাঁড়ায় শিল্প। ভালবাসা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সাধনা শিল্পীদের। প্রিয় সতীর্থ শিল্পীর বেঁচে থাকার সংগ্রামে শরিক হওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে চিত্রশিল্পীগণ সমবেত হয়ে আয়োজন করেন “ছন্দিত বর্ণের নিভৃত কথন” শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। সাথীর চিকিৎসায় সহায়তার জন্য অর্ধশতের বেশি নবীন-প্রবীণ শিল্পীর শিল্পকর্মের সমাবেশ ঘটেছিলো এতে। ৪ থেকে ১২ মার্চ দৃক গ্যালারিতে এ প্রদর্শনী চলে।

জলরঙ, তেলরঙ, অ্যাক্রিলিক, মিশ্র মাধ্যম, ছাপচিত্র ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় মাধ্যমে শিল্পীরা তাদের চারপাশের জগতকে তুলে ধরেছেন ও কল্পনার ভিন্নজগৎ তৈরি করেছেন। এতে ছিলো রফিকুন নবীর অলস দুপুরের কাকের ছবি, সমরজিৎ রায়ের নিসর্গ, সাথীর আঁকা মায়াবী প্রকৃতিসহ নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের বিচিত্র অনুভবমালা। প্রদর্শনীতে অংশ নেন মনিরুল ইসলাম, হামিদুজ্জামান খান, আবুল বার্‌ক আলভী, আবদুল মান্নান, কালিদাস কর্মকার, আবদুস সাত্তার, চন্দ্র শেখর দে, কেএমএ কাইয়ুম, নাজলী লায়লা মনসুর, রণজিৎ দাস, আইভি জামান, জামাল আহমেদ, ঢালী আল মামুন, নাসরীন বেগম, রোকেয়া সুলতানা, নিসার হোসেন, শেখ আফজাল, শিশির ভট্টাচার্য, নাছিমা মাসুদ রুবী, মোস্তাফিজুল হক, জাহিদ মুস্তাফা, নাসিমা খানম কুইনি, উত্তম গুহ, লিটন ভূঁইয়া, রশীদ আমিন, রফি হক, আনিসুজ্জামান, মীর আহসানুল আলম, শিশির মল্লিক, মহিউদ্দিন আহমেদ, সুনীল কুমার পথিক, জাহেদ আলী চৌধুরী, গুপু ত্রিবেদী, উত্তম কুমার তালুকদার, মলয় বালা, আবদুস সাত্তার তৌফিক, মুকুল বাড়ৈ, বিপ্লব দত্ত, মেহেদী হাসান, কান্তিদেব অধিকারী, পিযুষ কান্তি সরকার, শামীম আকন্দ, যুবরাজ, তাহ্‌মিনা হাফিজ লিসা, ইকবাল হোসাইন, আজমীর হোসেন, বিশ্বজিৎ গোস্বামী, আশরাফুল হাসান, কামালুদ্দিন, সুলতানা পুতুল, সুব্রত দাশ, হানিফ পাপ্পু, সাহানা সুমী ও শাহনূর মামুনের শিল্পকর্ম।

ছন্দে ছন্দে বর্ণিল এ নিভৃত কথপোকথনে আনন্দ-মমতার সুর উচ্চকিত হলেও কিছু জীবনযন্ত্রণার ছাপও ছিলো। সাথীর জীবনযুদ্ধে সহযোগিতা করতে সতীর্থ শিল্পীদের এ সুন্দর আয়োজনটি প্রশংসনীয়।

শিল্পী রফিকুন নবী

শিল্পী আবদুল মান্নান

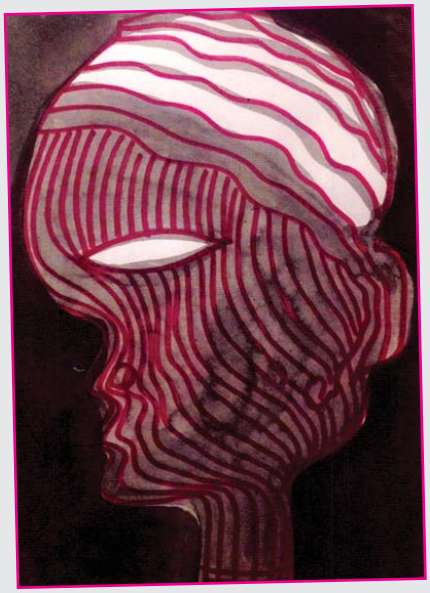

শিল্পী
হামিদুজ্জামান খান

শিল্পী ইকবাল হোসাইন

সিদীপে নববর্ষ